কাউণ্টার পয়েণ্ট

[রহস্য উপন্যাস]

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬৩

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
সুব্রত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৫১ ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

গুঞ্জা মুখোপাধ্যায় এবং

শেখর মুখোপাধ্যায়কে—

গভীর স্নেহ ও

আশীর্বাদসহ—

কাউণ্টার পয়েণ্ট

অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে কুশল এয়ারলাইন্সের বাস থেকে নেমে এল। এতক্ষন বুঝতে পারা যায়নি—এখন, কনকনে ঠাণ্ডা হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা কলকাতা নয়।

জানুয়ারীর এগার তারিখ আজ।

মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ পড়তে আরম্ভ করবে। কুশল অবশ্য জানে, যত ঠাণ্ডা পড়ার চাপ থাক না কেন, বিহারের কোন অঞ্চলে বরফ কখনও পড়ে না। গ্রেট কোটের কলার ভাল করে তুলে দিয়ে কুশল দ্রুত পায়ে টার্মিনাস বিল্ডিং-এর মধ্যে প্রবেশ করল।

কলকাতাগামী যাত্রীর সংখ্যা আজ এত কম কেন বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দরুন এই অবস্থা। কুশলকে মাসের মধ্যে কম করে বার দুয়েক পাটনায় আসতে হয়। তবু এখনও এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে সঠিক ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওয়েটিং হলের একটা কোচ অধিকার করে কুশল সিগারেট ধরাল। এক বন্ধুর অনুরোধের চাপে কিছুদিন হল ফোর স্কয়ার-এর প্রতি মন বসিয়েছে। ব্র্যাণ্ডটা মন্দ নয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। সেণ্টার সেকেণ্ড সিমাপ্টার বলছে, সাতটা পঁচিশ। অর্থাৎ প্লেন ছাড়তে এখনও আধঘণ্টার ওপর সময় বাকি। কয়েক টানে সিগারেটও ছোট হয়ে এল।

টুকরোটা সেণ্টার টপের ওপর রাখা সুদৃশ্য অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে কুশল উঠে দাঁড়াল। কোচের পাশেই অ্যাটাচি কেস রাখা ছিল। ঝুঁকে অ্যাটাচি তুলে নেবার মুখেই ওকে থামতে হল—সতর্কতার ধ্বনি মিলিয়ে যাবার পরই লাউড স্পিকার সরব হল, অ্যাটেনসন প্লীজ—

এরপর যাত্রীদের উদ্দেশ্যে ঘোষক যা বললেন তার সারমর্ম হল, ঘন কুয়াশার দরুন কলকাতাগামী ফ্লাইট নম্বর তিনশো ষোল ছাড়তে কমপক্ষেও দু ঘণ্টা বিলম্ব হবে। উপায়হীন অবস্থার দরুন যাত্রীবর্গকে এই অসুবিধার মুখোমুখি হতে হল। আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

কুশল আবার বসে পড়ল।

বিরক্তিবোধ চেপে বসল মনের ওপর। এই উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার জন্য এখন নিজেকেই দায়ী মনে হচ্ছে। আগামী সকালের ফ্লাইটে কলকাতা ফিরলে কোন অসুবিধা ছিল না। আজকের এই কনকনে রাত হোটেলের আরামদায়ক বিছানায় চমৎকার ভাবে কাটিয়ে দেওয়া যেত। এখনও আরো দু ঘণ্টা। অর্থাৎ সাড়ে নটার পর। তখনও আকাশ পরিষ্কার হবে কিনা ভগবান জানেন।

কুশল ভ্রূ কুঁচকে বসে রইল।

এতক্ষণ ওয়েটিং হলে বিশেষ লোক ছিল না। অ্যানাউন্সমেণ্টের পরই একে একে সকলে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। অধিকাংশ যাত্রীর মুখেই বিরক্তির ছায়া। কলগুঞ্জনে ভরে উঠল ওয়েটিং হল। কারুর কারুর কথাবার্তায় এমন মনে হচ্ছিল, আজকের শোচনীয় জল হাওয়ার দরুন দায়ী "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের" কর্তৃপক্ষ।

কুশল আবার সিগারেট ধরাল।

ঘনঘন কয়েকবার টান দেবার পরই শুনতে পেল বাইজোভ। মিঃ ব্যানার্জী, আপনি—

চমকে মুখ তুলল কুশল।

হাত কয়েকের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আদিত্য সোম। নামকরা এক ওষুধ কোম্পানির উনি মার্কেটিং ম্যানেজার। ওঁকেও প্রায় পাটনা আসতে হয়। এই যাওয়া-আসার পথেই আলাপ। কখনও কখনও একই হোটেলে উঠেছে দুজনে। আদিত্য সোমের বর্ধমানে বাড়ি।

কুশল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কবে এসেছিলেন ?

—বুধবার। আপনি—

—আমি পরশু এসেছি। ছিলেন কোথায় ? "মৌর্য্য"য় তো দেখতে পাইনি ?

—আমি এবার "আনন্দলোকে" উঠেছিলাম। কি ঝামেলায় পড়া গেল বলুন তো। আকাশ পরিষ্কার না হলে কতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে কুশল বলল, ওরা তো বলছে ঘণ্টা দুয়েক পরেই রওয়ানা হতে পারবো।

—অ্যাটমোসফেয়ার সম্পর্কে আগে থেকে শ্যাওর হওয়া চলে না। এমনও হতে পারে আমরা রাতভোর আটকে পড়লাম।

—এরাই আমাদের থাওয়া থাকার ব্যবস্থা করবে।

আদিত্য সোম ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তা তো করবেই। কিন্তু এতে আমার লাভ হচ্ছে না। ভেবেছিলাম, সাড়ে নটার মধ্যে পৌছে যাব। দমদম স্টেশন থেকে

দশটা কুড়ির লোকালটা ধরতে অসুবিধা হত না। আজ রাত্রেই বাড়ি পৌছে যেতাম। তা আর হল না।

মৃদু হেসে কুশল বলল, এতে আক্ষেপের কি আছে। ঠাণ্ডায় ট্রেন জার্নি করার চেয়ে কাল সকালে পৌছনো অনেক ভাল।

—সকালে বর্ধমানে একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল। আর ভেবে লাভ নেই। যা হবার হবে। চলুন, রেস্টুরেণ্টে গিয়ে বসা যাক।

—গলাটা একটু গরম করে নিলে মন্দ হবে না। চলুন—

দুজনে ওয়েটিং হল থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে পৌছল। ভিড় বিশেষ নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুন ভারী মনোরম পরিবেশ। এক কোণ ঘেঁষে দুজনে বসল মুখোমুখি। জোরাল আলো নেই। কেমন ছায়া-ছায়া পরিবেশ।

সোম বললেন, দু পেগ করে রাম খাওয়া যাক, কি বলেন ?

—আমি কফি পছন্দ করবো। আপনি চাইলে—

—ঠিক আছে। কফিই হোক। এক যাত্রায় পৃথক ফলের কোন মানে হয় না। পরিবেশক এসে পড়েছিল। কফির অর্ডার দেওয়া হল। এসেও পড়ল কফি এক-সময়। নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হতে হতে একসময় পেয়ালা শেষ হল।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে সোম বললেন, আমি কিছুক্ষণ থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি।

—কি ব্যাপার ?

—আমাদের বাঁ ধারের থার্ড টেবিলে একজন মহিলা বসে আছেন। উনি বার বার তাকাচ্ছেন আমাদের দিকে। আমি মহিলাকে চিনি না। দেখুন তো, আপনার চেনা-জানার মধ্যে কেউ কিনা।

কুশল মুখ ফিরিয়ে দেখল। সাজপোশাকে শালীনতার পরিচায়ক। তবে মুখ দেখতে পেল না। মহিলা তখন একজন পরিবেশকের সঙ্গে অন্য ধারে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলছেন।

কুশল বলল, পাটনায় কোন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। উনি বোধহয় আমাদের টপকে আর কাউকে দেখছিলেন।

—হতে পারে। চলুন, ওঠা যাক।

পরিবেশককে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। আর কতক্ষণ ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এখন এটাই হল প্রশ্ন। দুর্ভোগ একেই বলে। কয়েক পা এগিয়েছে দুজনে—বেশ—

বেশ!!!

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল কুশল। এই সম্বোধন করার লোক তো বহুদিন আগেই তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তবে—? সেই মহিলা এগিয়ে এসেছেন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের বেশী নয়। সুষমার লালিমা মুখে পরিব্যাপ্ত। তবে সিঁথিতে সিঁদুর নেই।

কুশলের গলা থেকে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল।

—তুমি এখানে?

ওর বিস্ময় হিন্দীতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

মহিলা আরো এগিয়ে এসে হিন্দীতে বললেন, অনেকক্ষণ থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছি। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

—আমিও ভীষণ অবাক হচ্ছি। বোধহয় দশ বছর পরে দেখা। আজকাল পাটনাতেই আছো নাকি?

—না। বছরে বার চারেক আসতে হয়। দশ বছর নয়, আমাদের দেখা হল প্রায় বার বছর পরে।

কুশলের এবার শিষ্টাচারের কথা মনে পড়ল।

দ্রুত গলায় বলল, মিঃ সোম, ঋতু মাথুর—এলাহাবাদে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। ঋতু, ইনি আমার বন্ধু আদিত্য সোম। বড় এক কোম্পানির এক্সিকিউটিভ।

নমস্কার বিনিময়ের পর সোম বললেন, বহুদিন পরে আপনাদের দুজনের দেখা। অনেক কথা জমা হয়ে রয়েছে নিশ্চয়। আপনারা আলাপ করুন। আমি বরং ওধার থেকে ঘুরে আসি।

কুশল বাধা দেবার আগেই সোম লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন রেস্টুরেণ্ট থেকে ঋতু মৃদু হাসল। ওরা কোণের দিকে একটা টেবিল অধিকার করল। অদ্ভুত অনুভূতিতে কুশলের মনের ভেতরটা চিনচিন করে চলেছে।

কথা নেই কারুর মুখে।

পরিবেশক এসে কফির অর্ডার নিয়ে গেল।

ঋতুই নীরবতা ভঙ্গ করল।

—বেঞ্জ—

—বল?

—এতদিন পরে দেখা। আমরা চুপচাপ বসে থাকবো বুঝি?

—না। আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুমি আমার সামনে বসে আছো।

—বসে যে আছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে

যায় কখনও-সখনও। কোথায় আছো এখন ? মনে হচ্ছে কাজকর্ম ভালই করছো ?

সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার পকেট থেকে বার করল কুশল।

—আজকাল কলকাতায় থাকি। বড একটা কোম্পানিতে ভাল পোস্টেই আছি। চলে যাচ্ছে এক রকম ভাবে। কিন্তু তুমি—

—থামলে কেন ?

—তোমার মধ্যে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করছি। মানে…

ঋতু ম্লান হেসে বলল, সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন জানতে চাইছো ?

—সিঁদুর তো থাকারই কথা।

—কিন্তু বেঞ্জ—আমাদের দেশের বিধবা মহিলারা তো সিঁদুর পরে না।

—মাথুর সাহেব—

—বছর ছয়েক আগে মারা গেছেন।

একটা আড়ষ্টতা কুশলকে পেয়ে বসলো।

—তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমার আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হয়নি।

ঋতু এবার স্বাভাবিক গলায় বলল, এত সঙ্কোচ করছো কেন ? বহুদিন পরে দেখা হয়েছে তো কি হয়েছে ? আমার সম্পর্কে সমস্ত কথাই তোমার জানার অধিকার আছে। তুমি তো জানো, মাথুরসাহেব আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তার ওপব হার্টের রোগ। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সধবা অবস্থায় আমি খুব বেশীদিন থাকতে পারবো না।

—তারপর—

—আমার বিবাহিত জীবনের মেয়াদ ছ বছর। মাথুর সাহাব আমাকে একটি মেয়ে আর প্রচুর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

কুশল এতক্ষণ পরে সিগারেট ধরাল।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মেয়ের এখন বয়স কত ?

—আটে পড়েছে। কার্শিয়াং-এর এক কনভেন্টে আছে। দেখতে হয়েছে আমারই মত। এবার নিজের সম্পর্কে কিছু বল ? ছেলেমেয়ে কটি ?

—বিয়ে করলে তবে তো ছেলেমেয়ে হবে।

সবিস্ময়ে ঋতু বলল, সে কি—বিয়ে করনি ! কেম ?

কুশলের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

—সে অনেক কথা ঋতু।

—আমাকে বলতেও বাধছে ?

—না না, বাধবে কেন। তোমার বিয়ের পর মনের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে পড়ল যে পড়া ছেড়ে দেব ভাবলাম। তখনকার মনের অবস্থার কথা আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারবো না। মানে—

—আমি জানি বেশ তুমি আমাকে ভীষণ ভালবাসতে।

—আর তুমি—?

—আমিও। তারপর কি হল বল?

—মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কত চাপের মুখে থাকে তুমি জান না। অনিচ্ছার সঙ্গেই পরীক্ষায় বসতে হল শেষমেষ। কিভাবে জানি না, এম. এস.-সির বেড়া পারও হয়ে গেলাম। বাবা মারা গেলেন এই সময়। আর্থিক দিকটা ভারী শোচনীয় হয়ে উঠল। দু বছর পর চাকরি পেলাম। কর্মস্থল হল কলকাতা। মা আর কুনালকে নিয়ে চলে গেলাম ওখানে। কুনালকে তোমার মনে আছে তো?

—তোমার ছোট ভাই কুনালকে আমার মনে থাকবে না? ভাবী ভাবী করে সব সময় আমাকে খেপিয়ে মারতো। তারপর কি হল?

—কুনালকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলাম। ঠিকঠাক চলছিল সমস্ত কিছু। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। একদিন—

—থামলে যে—

—কুনাল মারা গেল ঋতু। ডবল ডেকারের চাকার তলায় তার শরীর মাংস-পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

স্থান কাল ভুলে ঋতু কুশলের হাত চেপে ধরল।

—কুনাল নেই—

—না। মাত্র আঠারো বছর বয়সে সে চলে গেছে। মা পাগলের মত হয়ে গেলেন। ওঁকে সামলানো আর চাকরি করা আমার কাছে দুর্ঘট হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন এল, মাও চলে গেলেন। আমি একা হয়ে গেলাম। চাকরিতে অবশ্য উত্তর-উত্তর উন্নতি হয়ে চলেছে। এই হল আমার ইতিকথা।

—একা হয়ে পড়েছো বলেই তো তোমার বিয়ে করা উচিত ছিল।

—উচিত কর্মটা আমি করতে পারলাম না। তুমি আমার জীবনের সব ধারা পাল্টে দিয়েছিলে। অথচ তোমাকে পাশে পেলাম না। কাজেই আর কাউকে মনে জায়গা দেওয়া সম্ভব হল না।

—আমি বলবো এটা পাগলামি।

—হয়তো। মানুষ তো কত রকম বিকারের শিকার হয়।

—বেশ—

—বলো ?

—আমার কথা তোমার মনে পড়তো ?

—অবান্তর প্রশ্ন। তুমি শুনেছো তোমাকে পাশে পাইনি বলেই বিয়ে করিনি বরং আমি তোমাকে ঐ প্রশ্নই করি। আমাকে মনে পডতো তোমার ?

ভারী নিঃশ্বাস ফেলে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ঋতু। তারপর থেমে থেমে বলল, আমার বিবাহিত জীবন ভারী অসুখী ছিল। ভদ্রলোক খারাপ ছিলেন না। তবে তাঁর আসক্তি আমার প্রতি ছিল না—ছিল, অর্থের প্রতি। নিজের ব্যবসার মূলধনকে কিভাবে চতুর্গুণ করে তোলা যায় সেই দিকেই তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকতো তাছাডা তিনি আমার চেয়ে বাইশ বছরের বড ছিলেন।

—কি বিশাল অবিচারের বোঝা তোমার ওপর চাপানো হয়েছিল !

– ঠিক তাই। আমি প্রতিবাদ করতে পারিনি। রক্ষণশীল পরিবারের অল্প-বয়সী আমি সেদিন সাহস সংগ্রহ করতে পারিনি। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর বেঞ্চ, প্রতিদিন অসংখ্যবার তোমার কথা মনে পড়তো।

পানীয়র কথা কারুর মনে ছিল না।

দু কাপ কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে কুশল বলল, পৃথিবীটা বোধহয় ছোট হয়ে আসছে। আবার যে দেখা হবে কে ভেবেছিল ?

—আমিও ভাবিনি।

—ঋতু তুমি কি বল, আজকের পর আমাদের আবার দেখা হবে ?

—নিশ্চয়। কলকাতায় কোথায় থাকো তুমি ?

—পাম এভিনিউ-এ। বছর কয়েক আগে ফ্ল্যাট কিনেছি।

—ফোন আছে ?

—অ্যাপ্লাই করেছি।

—ঠিকানাটা লিখে দাও।

পকেট থেকে কোম্পানির কার্ড বার করে, তার উল্টো দিকে ঠিকানাটা লিখে দেবার আগেই কুশলকে থামতে হল, তিনজন ভদ্রলোক ওদের টেবিলের সামনে এসে থামলেন। তাঁদের সাজপোশাকের পারিপাট্য লক্ষণীয়। বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে কেউ নন। ঋতু ভ্রূ কুঁচকে তাকাল ওঁদের দিকে। তারপর কুশলের দিকে তাকাল।

—এঁরা আমার শ্বশুরবাড়ির লোক।

কুশল মাথা ঝাঁকিয়ে সৌজন্যতা প্রকাশ করল।

তিনজনের মধ্যে যিনি স্মার্ট দর্শন, তিনিই এবার মুখ খুললেন, এঁকে চিনতে পারলাম না ?

—কুশল ব্যানার্জী। এলাহাবাদে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। ব্রজবাবু কোথায় ? তাঁকে দেখছি না !

—এই যে ম্যাডাম। আমি এখানে।

কথা শেষ করেই তিনজনের পিছন থেকে একজন দর্শন দিলেন। বয়স পঞ্চাশের ওপরেই হবে। দোহারা গড়নের মানুষ। মুখ চোখে বুদ্ধির ছায়া বিরাজ করছে। পরনে তাঁতের ধুতি। শরীরের উপরাংশ পুরু বাদামী রং-এর গরম চাদরে ঢাকা।

—ব্রজবাবু—

—আজ্ঞে—

—কখন প্লেন ছাড়বে জানতে পারলেন কিছু ?

ব্রজবাবু বললেন, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে ম্যাডাম। জল হাওয়া খুবই খারাপ। আজ প্লেন ছাড়বে কিনা সন্দেহ।

—বলেন কি—ঋতু আঁতকে উঠল, আমরা রাত ভোর করবো কি ? এইভাবে এখানে বসে থাকতে হবে ?

কুশল ইতিমধ্যে কার্ডের একধারে নিজের ঠিকানাটা লিখে ফেলেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে কার্ডটা ঋতুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। প্লেন যদি না ছাড়ে, অথরিটি আমাদের ভাল একটা ব্যবস্থাই করবেন। এখন চলি—

আর কিছু শোনার অপেক্ষায় কুশল ওখানে দাঁড়াল না। দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। স্মার্ট দর্শন ভদ্রলোক ওর গতিশীল দেহটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন, তারপর মুখ ফেরালেন ঋতুর দিকে।

হাল্কা সুরে বললেন, আপনার এলাহাবাদের প্রতিবেশী বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতেই কথা বললেন লক্ষ্য করলাম।

সারা মুখ ঋতুর লাল হয়ে উঠল।

তারপর তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এতে আপনার অস্বস্তির তো কারণ থাকতে পারে না। আর একটা কথা, মনে রাখবেন, আমি অনধিকার চর্চা একেবারে পছন্দ করি না।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, ব্রজবাবু, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বেন না। খোঁজ খবর নেন গিয়ে। আমি ওয়েটিং হলে গিয়ে বসছি।

ঋতু উঠে দাঁড়াল।

ব্রজবাবুর অনুমানই ঠিক।

মিনিট পনেরো পরেই অ্যানাউন্সমেণ্ট হল। যাত্রীসাধারণকে জানানো হল, শোচনীয় জল হাওয়ার দরুন আজ কোনমতেই রওয়ানা হওয়া সম্ভব নয়। তবে যাত্রীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন হোটেলে সকলের থাকার এবং নৈশ আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরোধ জানানো হচ্ছে, নিজের নিজের টিকিট নিয়ে একে একে তিন নম্বর কাউণ্টারে চলে আসুন।

আদিত্য সোম অসহায় ভঙ্গীতে কুশলের দিকে তাকালেন। অর্থাৎ আগামী কাল সকালে বর্ধমানে তাঁর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রক্ষা করা গেল না। অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বা হতাশার ছায়া পড়েছে। কুশলের অবশ্য তেমন কোন তাড়া নেই, তবে এই পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতেও ভাল লাগছে না। একটা ব্যাপার অবশ্য ওকে অন্যভাবে উতলা করে রেখেছে।

ঋতু !!!

এতদিন পরে যে ঋতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে মনের কোণেও কোনদিন স্থান দেয়নি। সেই অসম্ভব ঘটনাটাও ঘটে গেল। তার জীবনে বিপর্যয় কম আসেনি। তবু এখনও সে ভারী বাস্তবপন্থী—উচ্ছল।

আদিত্য সোম তাড়া দিলেন, যা হবার তা তো হল। এখন চলুন হোটেলের ব্যবস্থা করে ফেলা যাক।

মৃদু হেসে কুশল বলল, আর কিছু না হোক এই ঝামেলায় সরকারী খরচে এয়ারপোর্ট হোটেলে এক রাত অন্তত থাকা যচ্ছে। চলুন—

সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে আধঘণ্টাটাক সময় লাগল। কুশলের জন্য ২১০ নম্বর ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। আদিত্য সোম পেলেন ২৩০।

ডিনার শেষ হয়ে গেল সাড়ে নটার মধ্যেই।

আদিত্য সোম আর কুশল একই টেবিলে বসে দক্ষিণ হাতের কাজটা শেষ করেছে। মন বসিয়ে খেতে পারেনি। থেকে থেকেই ওকে অজানা এক অনুভূতি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে সোম বললেন, আপনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে ?

—হ্যাঁ। পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

—ঐ মহিলা মানে

—মহিলার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত। পরে আপনাকে বলব সব কথা।

সোম ও প্রসঙ্গে আর কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কুশলও সেকেণ্ড ফ্লোরে পৌছবার পর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। জামাকাপড় ছেড়ে রাত্রিবাস চাপিয়ে নিল। সিগারেট ধরাল তারপর।

কত নম্বর ঘরে ঋতু রয়েছে কে জানে? ডাইনিং হলে তো ওকে দেখা গেল না। খাবার বোধহয় ঘরেই আনিয়ে নিয়েছে। ঋতু অবশ্য একা নেই। সঙ্গে কয়েকজন লোক রয়েছে। ওরা পাটনার অধিবাসী না, কলকাতা থেকে সঙ্গে এসেছে?

কুশল এবার নিজের ওপরই বিরক্ত হল। এই অবান্তর আগ্রহের কোন মানে হয় না। সোফায় বসে পড়ে অর্ধেকও না পোড়া সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিল। এই সময় ওর দৃষ্টি পড়ল টেলিফোনের উপর। ফোনে জেনে নেওয়া যায় ঋতুর ঘরের নম্বর।

কুশল রিসিভার তুলে নিতে গিয়েও থামল। আজ এমন হচ্ছে কেন? নিজেকে কঠিন রাখাই যেন কঠিন হয়ে পড়ছে! ঋতুকে কুশল অবশ্য জীবনে ভুলতে পারতো না। তবে দৈবাৎ দেখা না হয়ে গেলে এতটা উতলা হবার কোন কারণ ছিল না এটাও ঠিক।

সোফায় একটু হেলে বসল কুশল। ঘটনার বিস্তার অনেক বছরের পুরনো হলেও সমস্ত কিছু পরিষ্কার মনে আছে। এলাহাবাদের জর্জ টাউন এলাকায় পাশাপাশি দুটো বাড়িতে ঋতু আর কুশলদের বসবাস ছিল। সচ্ছলতার ব্যাপারে দিক্ষিতরা অবশ্য ওদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। পাশাপাশি থাকার দরুন দুজনের মধ্যে পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। সেই পরিচয় যে কবে প্রেমে পরিণত হল তার হিসাব ওরা রাখেনি।

সময় ভালই কাটছিল। সকলের অগোচরে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্নের জাল বুনতে ভারী ভাল লাগতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। অর্থাৎ জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা। দিক্ষিতরা ব্যাপারটা মেনে নিতে রাজী হলেন না। একদিন ঋতুর দাদা কদর্য ভাষায় কুশলকে অপমান করে গেল। ঋতুকে চোখে চোখে রাখা হতে লাগল। এমন কি তার বাড়ির বাইরে বেরুনোও বন্ধ হল।

মনমরা ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত কুশল। তার তরুণ মন কিছু একটা করার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অসহায়তার কথা মনে

পড়ে গেলে কাহিল হয়ে যেত। বাড়ির পিছন দিকে গাছগাছড়ায় ভরা কিছুটা জমি ছিল। এই নির্জন জায়গায় মিলিত হত দুজনে। বিকেলের পর ওখানেই গিয়ে বসে থাকতো। আর আকাশপাতাল ভাবতো।

সেদিন ওখানেই গিয়ে বসেছিল। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। দেড়মাস হয়ে গেল ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আর কখনও একান্তে দেখা হবে কিনা সন্দেহ। আরো কতক্ষণ বসে বসে ভাবতো কে জানে। হঠাৎ চটকা ভাঙল। কে ওর কাঁধে হাত রেখেছে। চমকে মুখ তুলল কুশল।

ঋতু !!!

—তুমি—

—কোন রকমে চলে এলাম।

তারপরই ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল ঋতু। কুশল কি বলবে ভেবে পেল না। ওর ভাল লাগছিল, আবার একটা ভয় মনকে সাপটে ধরার চেষ্টা করছিল।

—ওরা কেন ক্ষেপে গেছে বল তো ?—ঋতু কুশলের বুক থেকে মুখ তুলে বলল, অন্য কোন জাতের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তোমার অপরাধ তুমি বাঙালী।

—না, ঋতু, আরো অপরাধ আমার আছে। আর্থিক দিক থেকে আমরা কয়েক ধাপ নীচে রয়েছি তোমাদের, তাছাড়া এখনও আমার চাকরি হয়নি। এমন জামাই কে চায় ?

—চাকরি আজ হয়নি—কাল হবে। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন দাম নেই ? আমি কার সঙ্গে জীবন কাটাবো তা স্থির করার দায়িত্ব তো আমারই। কিন্তু এ কি অবিচার বল তো।

কুশলের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো !

—এদেশের রক্ষণশীল সমাজ এত স্বাধীনতা মেয়েদের দেয় না। এছাড়া তুমি বল ঋতু একজন বেকারের হাতে তাঁরা মেয়ে কেন তুলে দেবেন ?

—আমি চাইছি বলে, আর কেন ? অসুবিধা যদি কারুর হয়, আমার হবে। সব জেনেই তো আমি এগুচ্ছি।

—তোমার ইচ্ছে বা অনিচ্ছের মূল্য এখানে কানাকড়িও নয়। ওঁরা যা স্থির করবেন সেটাই তোমার ভবিষ্যৎ।

একটু থেমে ঋতু বলল, আমি কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছি।

—ঠিক করে ফেলেছো ?

—হ্যাঁ। আমি সাবালিকা নিশ্চয় সকলে স্বীকার করবে ?

—তাতে সন্দেহের কি আছে।

—চল না, এদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা কোথাও চলে যাই। আইন তো আমাদের দিকে। ওখানে আমরা ঘর বাঁধব।

মহা আশ্চর্য হয়ে কুশল বলল; আমরা পালিয়ে যাবো। তুমি—

—এটাই হল ঠিক পথ। এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ বেঞ্জ।

—তুমি ঠিকই বলছো। তবে এর পরই অনেক বাস্তবমুখী প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হবে। তখন—

কুশলের কথা শেষ হল না। ঠিক সেই সময় দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রাকেশ। রাগে কাঁপছে সে। সারা মুখে যেন আগুন জ্বলছে। সজোরে এক চড় মারল ঋতুর মুখে। তারপর হাত চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

অবিবাহিতা ঋতুকে সেই শেষ দেখল কুশল।

তারপর দীর্ঘ বার বছর পরে আজ ঋতুকে দেখল এখানে। তাও বিধবা অবস্থায়। কুশল হাই তুলল। ওর সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল ছিল। মনের মধ্যেকার এই অস্বস্তিকে আদবেই কাটানো যাবে কিনা সন্দেহ। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দেখা যাক ঘুম আসে কিনা।

ওদিকে—

দুশো ষোল নম্বর ঘরে খাওয়াদাওয়ার পর কাপড় বদলে ঋতু সবে আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবতেই পারা যায় না, এত দিন পরে এমন নাটকীয় ভাবে বেঞ্জের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। মনে হয় সময় ওকে কিছুটা বদলে দিয়েছে। কিন্তু এখনও ভারী স্মার্ট—ভারী আকর্ষণীয়।

ঋতুর চিন্তা ভাবনায় সময় বাধা পড়ল। দরজা লক করা ছিল না। এক ভদ্রলোক পাল্লা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা গড়নের, মাঝারি উচ্চতার পুরুষ। পরনের স্টিল কলারের স্যুটে ভাঁজ রয়েছে এখানে ওখানে।

ঋতু সবিস্ময়ে বলল, দাদা! তুমি—

রাকেশ রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, সন্ধ্যার মুখে পাটনা পৌঁছলাম। দৌলতরাম বলল, তুমি এসেছিলে—আটটার ফ্লাইটে চলে যাচ্ছ।

—গতকাল হাতুয়া মার্কেটে তোমার পার্টনারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—ফোন করে জানলাম প্লেন আজ ছাড়ছে না। তোমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে। ভাবলাম দেখা করেনি। বহু কষ্টে এসেছি।

—প্রাকৃতিক অবস্থা তো আজ ভারী খারাপ। এসে পড়ে ভালই করেছো।

ওখানকার খবর কি? বৌদি ছেলেরা—

রাকেশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে করতে বলল, খবর মোটামুটি ভালই। এমাস থেকে এলাহাবাদের কারবারটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিলাম। একা কত সামলাবো?

—ভালই করেছো। বসো।

দুজনে বসলো মুখোমুখি।

সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে রাকেশ বলল, আমি কলকাতাতে যেতাম। দেখা যখন এখানে হয়ে গেল তখন খোলাখুলি কথাবার্তা হোক।

—নিশ্চয়। কোন্ প্রসঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাইছো?

—আগেও বলেছি। তুমি তেমন আমল দাওনি। কথাটা তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে।

ভ্রূ কুঁচকে ঋতু বলল, একবার আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা ভেবেছিলে, তার পরিণাম দেখতে পাচ্ছ। আবার ও সমস্ত কথা বলে আমাকে কেন বিরক্ত করে তোল?

—ভাগ্যকে তো দেখা যায় না। লোকটা যে এত তাড়াতাড়ি মরে যাবে কে জানতো। যা হবার হয়ে গেছে। এখন—

—না। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমরা আর ভেব না। আমি এখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের দুনিয়া দেখা মহিলা। যদি কিছু স্থির করতে হয় তবে তা আমি নিজের দায়িত্বেই করবো।

—একশোবার। আমি তাই চাই তুমি একটা কিছু স্থির করো। তোমার দেওরদের মতলব ভাল নয়। ওরা আমার বন্ধুস্থানীয়, তাই কিছু কিছু আঁচ পেতে অসুবিধে হচ্ছে না।

—ওরা আমায় ঠকাবে?

—হ্যাঁ। আইনের সমস্ত মারপ্যাঁচ তোমার জানা নেই। তবে তার আগেই আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারি।

ঋতুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল। সরে গেল বন্ধ জানলার দিকে।

—অর্থাৎ লোকেশ টানভানকে আমায় বিয়ে করতে হবে?

—হ্যাঁ। লোকেশ তোমার মেজ দেওর বিনোদের শালা। তখন ছোটজন প্রমোদকে কিছু করতে দেবে না বিনোদ। নিজের শালার স্বার্থটাই সে বড় করে দেখবে। তোমার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত কিছু সুরক্ষিত থাকবে।

ঋতু প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

মুখ না ফিরিয়েই বলল, তুমি কি শহরে ফিরে যাবে ?

—এই জল হাওয়ায় ফেরা যাবে না। ঘর নিয়েছি হোটেলে।

—কিছু মনে করো না দাদা। আমার এখন বিশ্রামের দরকার। তুমি বরং এখন নিজের ঘরে যাও। কাল কথা হবে।

—তুমি সমস্ত ব্যাপারটাকেই এড়িয়ে গেলে। যদি নিজেব ভালো বোঝার চেষ্টা না কর, তবে আর কি বলার থাকতে পারে।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, শুনলাম, আমাদের এলাহাবাদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—শুধু দেখা নয়, অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তাও হয়েছে।

—সে কে—

—এই হোটেলেই আছে।

রাকেশ কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল ঋতুর দিকে তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। নির্জন, টানা করিডর দিয়ে দ্রুত হেঁটে গিয়ে থামল দুশো চল্লিশ নম্বর ঘরের সামনে। করাঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে তখন শালা-ভগ্নীপোত অর্থাৎ লোকেশ আর বিনোদ হুইস্কির স্বাদ নিচ্ছিল। বিমর্ষ ভঙ্গীতে ওদের পাশে গিয়ে বসল রাকেশ।

লোকেশ একটা গেলাসে বোতল থেকে পানীয় ঢালবার উপক্রম করতেই রাকেশ বাধা দিল, থাক। মুড নেই।

বিনোদ গেলাসের তলানিটুকু শেষ করে নিয়ে বলল, মনে হচ্ছে সুবিধে করতে পারেনি ?

—ভারী হার্ডনাট ভাই।

—হার্ড না ছাই। গুছিয়ে বলতেই পাচ্ছ না।

—বেশ তো। তুমি গিয়ে গুছিয়ে বল না।

—আমি বললে কাজ হবে না। এক নম্বরের ইডিয়েট হচ্ছে আমার এই শ্যালক। বিয়ে করবেন উনি আর মাথা ঘামাতে থাকবো আমরা ?

গেলাস নামিয়ে রেখে লোকেশ বলল, আপনি আমায় গাল দিচ্ছেন্ন কেন ?

—একশোবার দেব। স্মার্ট হবার বড়াই করো, অথচ খোলাখুলিভাবে কথা বলার সাহস পাচ্ছ না ! এদিকে, একজন ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করার জন্য মন উসখুস করছে।

—জামাইবাবু, আপনি আমাকে ভীতু বলতে পারেন না।

—পারি। একশোবার পারি।

লোকেশ উত্তেজিতভাবে বলল, কি ভাবে প্রমাণ করা যাবে আমি ভীতু নই। বলুন—যা বলবেন তাই করবো।

—তোমাকে এভারেস্টের ডগায় উঠতে হবে না। বৌদির কাছে গিয়ে, পরিষ্কার ভাবে কথা বলে নাও। তবে একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করো।

—বেশ। আমি রাজী।

লোকেশ উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময় ঘরে প্রবেশ করল প্রমোদ। ঋতুর ছোট দেওর। একহারা গম্ভীরদর্শন চেহারা। চোখে হালকা বাদামী লেন্সের চশমা। একমাথা কাঁচাপাকা চুল ঘাড়ের কিছুটা নীচে নেমে এসেছে।

—মনে হচ্ছে, গুরুতর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমি এসে বাধার সৃষ্টি করলাম না তো?

প্রমোদের কথা শুনে বিনোদ বলল, না না, তেমন কিছু নয়। বৌদির ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।

—আর কত দিন আকাশে কেল্লা বানাবার চেষ্টা করবে?

—তার মানে—

প্রমোদ বসতে বসতে বলল, একটা সরল ব্যাপারকে তোমরা অনর্থক জটিল করে তুলেছো। বৌদির ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আমাদের এই ভাবে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না।

বিনোদ গম্ভীর গলায় বলল, তুমি বাস্তব দিকটা একেবারেই লক্ষ্য করছো না। বৌদির পর তাঁর বিশাল প্রপার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করেছো?

—এতে চিন্তা-ভাবনার কি আছে। তাঁর যা আছে সব মেয়ে পাবে।

—ঠিক। কিন্তু সেই জামাই বাবাজীবন কেমন হবে আমরা জানি না। তবে এটা ঠিক, এখনকার মত যৌথ ব্যবস্থাটা বজায় থাকবে না। বিশ্রী এক অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে।

এবার প্রমোদের গলায় বিদ্রূপের আমেজ, লোকেশের সঙ্গে বিয়ে হলে সব দিক বজায় থাকবে, এই কথাই বলতে চাইছো? লোকেশ তো বাইরের লোক। ভবিষ্যতে যে যৌথ ব্যবস্থাটা বজায় থাকবে তার গ্যারান্টি কি?

—গ্যারান্টি আমি। লোকেশ আমার শালা। লোকেশ এমন কোন কাজ করবে না যা আমাদের ইণ্টারেস্টের বিরুদ্ধে যাবে।

—এখুনই কি ভাবে যে একথা বলছো আমার মাথায় ঢুকছে না। যা হোক,

রাকেশবাবু আপনি কি বলেন?

রাকেশ দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, আপনাদের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে আমার কিছু না বলাই ভাল। তবে আমি আমার বোনের সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ চাই। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে ও কি পেল বলুন?

—আপনি অন্যায় কিছু বললেন না। তবে বৌদিকে রাজী করানো যাবে বলে আমার মনে হয় না। এই সঙ্গে একথা ভুলে গেলে চলবে না, উনি একজন স্বাধীন-চেতা মহিলা। ওঁর পছন্দের মাপকাঠিতে রাম-শ্যামরা পড়ে না। আমি বোধহয় অন্যায় কিছু বললাম না। উঠি এবার।

প্রমোদ উঠে দাঁড়াল। তারপর কোন কিছু শোনার প্রত্যাশা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিনোদ কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। বিরক্তির সুরে লোকেশ বলল, উনি আমাকে প্রকারান্তরে অপমান করে গেলেন। আমি যে রাম-শ্যাম নই সেটা প্রমাণ করে দেব।

বিনোদ নিরাসক্ত গলায় বলল, প্রমোদ স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত। অবশ্য এখন ঠিক কথা বলল কিনা আমি জানি না। তবে তোমার হামবড়াই কয়েক মাস থেকে দেখছি। কাজে নামতে পাচ্ছ কই?

—আপনি আমাকে এভাবে বলবেন না। আপনার পরিকল্পনা মতই চলছি। সিরিয়াসলি প্রশ্ন করছি, কাজে নামবো?

—সাত কাণ্ড রামায়ণের পর সীতা কার ভার্য? তুমি হাসালে লোকেশ। এখনও জানতে চাইছো কাজে নামবে কিনা? সময় বয়ে যাচ্ছে। এখনও সাহস দেখাতে না পারলে, বাকি জীবন আপসোস করে কাটাতে হবে।

এতক্ষণ পরে রাকেশ বলল, আমার বোন অবশ্য একরোখা ধরনের। তবে আপনি কথাবার্তা বলে দেখতে পারেন।

লোকেশ নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল।

—আমি তাহলে কাজে নেমে পড়লাম। কাল সকালে আপনারা সুসংবাদই পাবেন। চলি—

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কুশল সোফা থেকে উঠে আড়ামোড়া ভাঙল। যতই মনকে অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে সফল হচ্ছে না। যে ক্ষত শুকিয়ে এসেছিল প্রায়, তা আবার দগদগে হয়ে উঠেছে। ঋতুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা জীবনের এক বিচিত্র মোড়। তবে আশার কথা কলকাতা ফিরে যাবার পর আর ঋতুর সঙ্গে দেখা হবে না। ও আবার

অশান্ত মন নিয়ে নিজের বৈচিত্র্যহীন জীবনে ফিরে যাবে।

কিন্তু ঠিকানা যে ঋতুকে দেওয়া হয়ে গেছে।

মনে হয় না সে খোঁজখবর নিতে আসবে।

কুশল রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। দশটা চল্লিশ। এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল উত্তর দিকের জানলাটার সামনে। কাঁচে ঢাকা জানলাটার সামনে পুরু পর্দা। পর্দা সরাতেই চোখে পড়ল বাইরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। অসময়ে বর্ষাকালের মত এমন বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না।

এই সময়ে মিষ্টি সুরে বেল বেজে উঠল।

চকিতে কুশল ফিরে দাঁড়াল।

এই সময় আবার কে এল? বেয়ারা বোধ হয়। কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জানতে এসেছে। ওর কোন প্রয়োজন নেই। এখন একমাত্র কাজ ঘুমের চেষ্টা করা। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

বেয়ারা নয়—

ঋতু!

দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ঋতু। তারপর ওর সামনে এসে মিষ্টি করে হাসল।

—অবাক হয়ে গেছো?

—অবাক হবারই তো কথা।

ঋতু ওর আরো কাছ ঘেঁসে বসল, আমি মনস্থির করে ফেলেছি বেঙ্গু। লাগাম ছাড়া জীবন আর ভাল লাগছে না।

—তুমি কি বলতে চাইছো?

—তোমার সঙ্গে নাটকীয় ভাবে দেখা হয়ে যাওয়াটা দৈবাৎ ঘটনা নয়, এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমি তোমাকে আর হারাতে চাই না।

—ঋতু—

—আমার সব আছে তবু আমি ক্লান্ত। এখন আমি তোমার ওপর নির্ভর করে শুধু ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচতে চাই না—জীবনটা খুশীতে ভরিয়ে তুলতে চাই। বলো বেঙ্গু—তুমি কি—

দ্রুত গলায় কুশল বলল, সময় সময় মানুষের জীবনে এমন অকল্পনীয় পরিবর্তন আসে যাতে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়। আমি সেই অনুভূতির মুখোমুখি এখন। একটু আগে অন্য কথা ভাবছিলাম। মনে হচ্ছিল—

—কি মনে হচ্ছিল তোমার?

—ও কথা যেতে দাও। তুমি যদি সত্যি মন স্থির করে ফেলে থাকো তবে, আমি নিজের ভালবাসাকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে চাই। আমি প্রমাণ করতে চাই আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর কেউ হবে না।

—বেশ—

ঋতু কুশলের বুকে ভেঙে পড়ল।

দু হাত দিয়ে সাপটে ধরে কুশল ওকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইল। কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল তার সময়ের হিসাব দুজনের কেউ রাখেনি। তারপর দুজনে দুজনের কাছ থেকে একসময়ে সরে এল। দুজনের মুখই উদ্ভাসিত। বসল গিয়ে দুজনে পাশাপাশি সোফাতে।

কুশল বলল, এরপর আমাদের করণীয় কি?

ঋতু কুশলের কাঁধে মাথা রেখে বলল, কলকাতায় ফিরেই আমাদের প্রথম কাজ হবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেসন অফিসে যাওয়া। তারপর তোমাকে গিয়ে উঠতে হবে আমার পাম এভিনউ-এর ফ্ল্যাটে। ছোট ফ্ল্যাট। অসুবিধা হবে।

—কলকাতায় আমার ছটা বাড়ি আছে। তবু আমি তোমার ফ্ল্যাটেই উঠবো। যত ছোটই হোক না কেন, তুমি দেখে নিও, কি চমৎকার ভাবে আমি ওখানে মানিয়ে নিয়েছি। তবে—

—কি হল?

—সব ঠিক থেকেও যেন ঠিক নেই। একটা কাঁটার মত কিছু মনে মধ্যে বিধছে। বোধহয় মন বলতে চাইছে, আমি তোমাকে ঠকাতে চলেছি।

বিস্ময়ের সুরে কুশল বলল, তা কেন? আমরা তো সব দিক বিচার করেই পা বাড়াচ্ছি। তুমি আমাকে ঠকাবে কেন?

ঋতু সোজা হয়ে বসে বলল, আমাদের বিচারবিবেচনার মধ্যে লুনার হিসাবটা আমরা ধরিনি। আমার মেয়ে লুনা। আমি তোমার জীবনে যাব—অথচ লুনা—সে—

গলা তুলে হাসল কুশল।

—তাকে তো হিসাবের মধ্যেই রেখেছি। সে আমার মেয়ে।

ঋতু নিবিড় ভাবে সরে এল কুশলের দিকে।

—তুমি তো কোন পরীক্ষাতেই ফেল করছো না!

—কখনও তো কোন পরীক্ষায় ফেল করিনি।

ঋতু হাসল।

—যাক, অনেক দিন পরে ভারী ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, মাঝের বারটা

বছরের ফাঁক মিলিয়ে গেছে। পার্থক্যের মধ্যে আমরা দুজন শুধু এলাহাবাদে নেই, পাটনায় আছি।

—কলকাতায় একসঙ্গে থাকবো।

—ঠিক। আচ্ছা, লুনা কি আমাদের সম্পর্কটা খুসী মনে মেনে নেবে?

কুশল এতক্ষণ পরে সিগারেট ধরিয়েছিল।

ধোঁওয়া ছাডতে ছাড়তে বলল, মনে হয় না মেনে নেবে। বিরক্ত হবে। অবাধ্যতা করবে। তোমার মুখের ওপর এমন কথাও বলতে পারে যা ওর বলা উচিত নয়।

—কি হবে তাহলে?

—আমাদের দীর্ঘ ধৈর্য পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। ভাল ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে আমাকে। সময় কাটবে। ওর মনও নরম হতে থাকবে। স্বাভাবিক নিয়মের এই তো দস্তুর।

—ঠিকই বলছো। ওর প্রাথমিক বেয়াদপি আমাদের সহ্য করে যেতে হবে। মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ও তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।

—কেন এমন মনে হচ্ছে তোমার?

—আমি কি তোমায় ভাল না বেসে থাকতে পেরেছিলাম। জীবনে এত ওঠা-পড়া গেল, তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি। ভোলার চেষ্টাও করিনি কখনও।

ঋতু উঠে দাঁড়াল।

—যাচ্ছ—

—না। রাতটা এখানেই থাকবো ভাবছি।

অবাক হয়ে কুশল বলল, এখানে থাকবে?

—হ্যাঁ। তোমার কাছে থাকবো। তুমি অবাক হচ্ছ কেন? আমার কি মনে হচ্ছে জান, তুমি এখনও সিরিয়াস হতে পারনি।

কুশল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এল।

ঋতুর কাঁধে হাত রেখে বলল, এত সিরিয়াস বোধহয় আমি কখনও হইনি। তবে সংস্কারের ছিটেফোঁটা বোধহয় এখনও মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

—তাহলে—

—তাহলে আবার কি? আমরা একসঙ্গেই থাকছি।

কথা শেষ করে কুশল হাসল। হাসিতে যোগ দিল ঋতু।

ঘুম ভেঙ্গে গেল

পা থেকে কম্বলটা সরিয়ে ঋতু উঠে বসল। হাল্কা পাওয়ারের ম্লান আলো ঘরে ছেয়ে রয়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কুশল একপাশ হেলে শুয়ে রয়েছে। প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল ঋতুর। কত—কতদিন পরে এমন একটা আকাঙ্ক্ষিত দিন ওরা দুজন একসঙ্গে কাটাতে পারল।

বিছানা থেকে ঋতু নামল।

কুশলকে এখন তুলবে না। মায়া হল। ঘুমচ্ছে ঘুমোক। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দেখল বৃষ্টি আর হচ্ছে না। অবশ্য আকাশে ছেঁডা, ছেঁডা মেঘের ভেসে বেডানোর বিরাম নেই। রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল ঋতু, ছটা দশ। মনে হয় বেলা নটার মধ্যে ওরা রওয়ানা হতে পারবে।

দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল।

একজন বেয়ারার সঙ্গে দেখা হল। সে দ্রুত এগুচ্ছিল, ঋতুকে দেখে গতি সংযত করে জানতে চাইল, ম্যাডামের এখনই চায়ের দরকার হবে, না, আধঘণ্টা পরে আনবে? ঋতু তাকে জানিয়ে দিল ২১৬ নম্বর ঘরে যত তাডাতাডি সম্ভব চা যেন দিয়ে যায়।

কয়েক পা এগিয়ে ঋতু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। অন্যমনস্কতার দরুন দরজায় চাবি লাগিয়ে যায়নি। বড আলোটা জ্বলছিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কুশলের কথা মনে পডল। চিরুনি তুলে নিয়ে, চুল ঠিক করে নেবার পর খাটের ওপর ঋতু এসে বসল। জীবনে এই প্রথমবার হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা হল তার।

মনোরম অভিজ্ঞতা।

বেয়ারা ট্রেতে পট আর পেয়ালা সাজিয়ে ঘরে ঢুকল এই সময়। ততক্ষণে সাইডপিসের ওপর রাখা ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে ঋতু কাউন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জানতে চেয়েছে কলকাতার ফ্লাইট কখন ছাডবে। বিনীত উত্তর এসেছে এখনও জানানো হয়নি। খবর এলেই ম্যাডামকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঋতু উঠে দাঁডাল।

বেয়ারা তখনও দাঁডিয়ে রয়েছে।

—তুমি কাপে চা ঢাল। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

ঋতু বাথরুমের দিকে এগুলো। দরজা ভেজানো ছিল, একটা পাল্লা হাত দিয়ে সরাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। আডাআড়ি ভাবে, উপুড হয়ে পড়ে আছে একজন সবল পুরুষ। সাজপোশাক মূল্যবান। মুখ দেখা যাচ্ছে না।

অজান্তেই ঋতুর মুখ থেকে আর্ত শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। বেয়ারা দ্রুত এগিয়ে

গেল বাথরুমের দিকে। এক ঝলক দেখে নেবার পরই তার বহুদর্শী মনের বুঝে উঠতে অসুবিধা হল না, একটা লোক মরে পড়ে আছে। ঋতুর শরীর থরথর করে কাঁপছিল। কোন রকমে সরে এসে বিছানার ওপর পড়ল।

বেয়ারা দ্রুত গলায় বলল, আপনি নার্ভাস হবেন না ম্যাডাম। আমি এখনই ম্যানেজারকে খবর দিচ্ছি।

এই ঠাণ্ডাতেও ঋতুর কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। গলা কেমন কাঠ কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে বলল, ২১০ নম্বরে মিঃ ব্যানার্জী আছেন। ওকে এখানে আসতে বল।

বেয়ারা দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঋতুর গা-বমি বমি করতে আরম্ভ করেছে। ও এখন কি করবে ?

কয়েক মিনিটের মধ্যে কুশল এসে পড়ল। সংবাদ পেয়েই ও বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। বাথরুমে একবার উঁকি মেরে নিয়েই ঋতুর পাশে এসে বসল। মৃত ব্যক্তি ওর পরিচিত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঋতুকে এখন কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। ভারী নার্ভাস হয়ে পড়েছে বুঝতে পারা যায়।

বিচলিত ভঙ্গীতে ম্যানেজার এলেন কয়েকজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে। এই দুঃসংবাদ কি ভাবে যেন চাউর হয়ে গিয়েছে। বহু বোর্ডার ২১৬ নম্বর ঘরের সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন। নানা ধরনের প্রশ্ন আর মন্তব্য ছয়লাপ চতুর্দিক। ম্যানেজার বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি দ্রুত বাথরুমের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কয়েক পা এগিয়ে এসে মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, কিভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো ?

ঋতু কোন রকমে বলল, আমি কিচ্ছু জানি না।

—আপনার বাথরুমে—মানে—

কুশলের দিকে তাকাল ঋতু।

ওর দু চোখে অসহায়তা ছাপিয়ে এসেছে।

—উনি ঘরে ছিলেন না।

কুশলের কথা শুনে ম্যানেজার অবাক হলেন।

—ছিলেন না ! কোথায় গিয়েছিলেন ?

ঋতু ধরা গলায় বলল, আমি মিঃ ব্যানার্জীর ঘরে ছিলাম।

—ম্যাডাম, আপনি কি মৃত ভদ্রলোককে চেনেন ?

—মুখ দেখতে পাইনি। বলতে পারবো না উনি কে।

এই সময় ঘরে হুড়মুড় করে প্রবেশ করল ঋতুর দাদা আর দুই দেওর। তাদের মুখের অবস্থা দেখবার মত। এছাড়া ঋতুর পাশে কুশলকে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসে থাকতে দেখে মন আরো উত্তাল হয়ে উঠল রাকেশের। ওরা তিনজন সকলকে ঠেলেঠুলে বাথরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরই আর্তরব বেরিয়ে এল বিনোদের মুখ থেকে।

—এ কি! এ তো লোকেশ—

ম্যানেজার দ্রুত গলায় প্রশ্ন করলেন, আপনি চেনেন?

—আমার শ্যালক। হে ভগবান, মরে গেছে নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে। ম্যানেজমেণ্টের পক্ষ থেকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। বডি আপনারা কেউ ছোঁবেন না। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।

বলতে গেলে ম্যানেজারের কথা শেষ হবার পরই সদলবলে স্থানীয় থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রমেশ পরিহার ঘরে ঢুকলেন। বিহার পুলিসের মার্কামারা চেহারার পরিহার কিছুটা গম্ভীরদর্শন। ম্যানেজারের সঙ্গে তার বিলক্ষণ পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে অকারণেই হোটেলে পদার্পণ করেন মুখ বদলাবার জন্য।

তিনি চারধারে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, ব্যাপারটা কি? বডি কোথায়? কার নামে ঘর বুক হয়েছিল?

প্রশ্নমালার মুখোমুখি হয়ে ম্যানেজার কিছুটা ঘাবড়ালেও, যতদূর সম্ভব সংযত গলায় বললেন, ব্যাপারটা যে প্রকৃতপক্ষে কি তা আমিও জানি না। বডি বাথরুমে পড়ে আছে। লোকটা অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে মনে হয়। এই ম্যাডাম—ঋতু মাথুরের নামে ২১৬ নম্বর বুক রয়েছে।

পরিহার আপাদমস্তক একবার ঋতুকে নিরক্ষীণ করে নিয়ে, বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মৃতদেহ একজন কনস্টেবলের সাহায্যে সোজা করে শোয়ালেন। বেশ শক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ রাইগার মার্টিস সেট ইন করে গেছে। ম্যানেজারের অনুমানই ঠিক, বহুক্ষণ আগে মারা গেছে লোকটা। ঘণ্টা ছয়েক আগে তো বটেই। কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। গলায় যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনও কোন বৈলক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

হার্টফেল?

তাই যদি হবে, তবে লোকটা পরের ঘরের বাথরুমে এসে মরল কেন? অকারণে নিশ্চয় কিছু ঘটেনি। প্রগাঢ় যৌবনা মহিলা আর যুবকের মৃতদেহ—ব্যাপারটা স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখার কোন মানে হয় না। হিন্দীতে যাকে বলে "ডাল মে কালা", সেরকম কিছু একটা নিশ্চয় আছে।

পরিহার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আদেশ জারী করলেন, ঘর থেকে সকলে বাইরে যান। আমি এখন মিসেস মাথুরের সঙ্গে কথা বলবো।

বিনোদ মনমরা গলায় বলল, আমার কথা শুনুন ইন্সপেক্টার সাহাব। যে মারা গেছে তার নাম লোকেশ। ও আমার শালা।

পরিহার নিজের শরীরটা একবার দুলিয়ে নিলেন।

—আপনার সম্বন্ধী। ভাল কথা। আপনার নাম কি?

—বিনোদ মাথুর। এ আমার ছোট ভাই প্রমোদ। আর ইনি রাকেশ দিক্ষিত আমার স্বর্গীয় দাদার সম্বন্ধী।

—চমৎকার। সম্বন্ধীর ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে। বিনোদবাবু, এবার বলুন তো আপনার সম্বন্ধী এই মহিলার বাথরুমে কেন ঢুকেছিলেন?

—তা তো বলতে পারবো না। আমি আর লোকেশ একই ঘরে ছিলাম। ও সাড়ে দশটার পর ঘর থেকে বেরিয়েছিল। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

—লোকেশ কে?

—যে মারা গেছে। মানে—

—ও। লোকেশ রাতভোর ঘরে ফিরল না, আপনার তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা হল না।

বিনোদ আমতা আমতা করে বলল, বেশী ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। সকালে প্রমোদ আমাকে ঠেলে তুলে এই দুঃসবাদ দিল।

—মিসেস মাথুরের সঙ্গে লোকেশের আলাপ পরিচয় ছিল?

—ছিল। উনি আমার বৌদি।

পবিহাব এবার সচকিত হলেন।

—তাহলে উনি—কি যেন নাম বললেন—

—রাকেশ দিক্ষিত।—রাকেশ বলল, ঋতুর আমি বড ভাই।

—আপনাদের পরিচয় পাওয়া গেল। ইনি কে? ইনিও কি আপনাদের আত্মীয় স্থানীর কেউ?

পরিহারের ইঙ্গিত কুশলের দিকে।

রাকেশই উত্তর দিল, আমাদের আত্মীয় নন। এলাহাবাদে প্রতিবেশী ছিলেন। হোটলে দৈবাৎ ঋতুর সঙ্গে ওর দেখা হয়।

কুশল উঠে দাঁড়াল।

—আমি কুশল ব্যানার্জী। "ওভারসিজ ইণ্টারন্যাশনাল"-এর এক্সিকিউটিভ।

কাজে পাটনায় এসেছিলাম।

পরিহার বললেন, ঠিক আছে। এবার আপনি নিজের ঘরে যান। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলবো। ভাল কথা, কত নম্বর ঘরে আছেন ?

—২১০। অলমোস্ট এই ঘরের প্রায় সামনে।

কুশল গমনোদ্যত হবার আগেই ঋতু বলল, ইন্সপেক্টার সাহাব মিঃ ব্যানার্জীকে এখানে থাকার অনুমতি দিন।

—কেন ?

—আমি রিলিফ বোধ করবো।

পরিহারের মুখে বিজ্ঞের হাসি দেখা দিল।

তিনি কিছু বলার আগেই বিরক্তিসূচক ভঙ্গীতে রাকেশ বলল, এর মানে কি ? আমি রয়েছি, তোমার দেওররা রয়েছে, তারপরও—

ঋতু ধরা গলায় বলল, হ্যাঁ। তারপরও—

—প্রত্যেক ব্যাপারের সীমা থাকা উচিত। তুমি কি বলছো তার অর্থ তুমি নিজেও বুঝতে পারছ না।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না।—পরিহার বললেন, বুঝতেই পারা যাচ্ছে আপনাদের চেয়ে উনি মিঃ ব্যানার্জীর উপরই বেশী আস্থাশীল। হ্যাঁ, বিনোদবাবু, আপনার সঙ্গে কথাটা এবার শেষ করি ?

—বলুন ?

—আপনারা দল বেঁধে পাটনায় এসেছিলেন কেন ?

—এখানে একটা ব্যবসায় তিনজনেরই শেয়ার আছে। দাদা তো নেই, বৌদিকে নিয়ে তাই মাঝে-মধ্যে আসতে হয়।

—আপনার সম্বন্ধী তো শেয়ারহোল্ডার নয়। সে এসেছিল কেন ?

—লোকেশ নাগপুরে ব্যবসা করতো। কলকাতায় এসেছিল কাজে। আমিই ওকে এখানে টেনে এনেছিলাম।

ব্যঙ্গের সুরে পরিহার বললেন, টেনে আনার ফল তো হাতেহাতেই পেয়েছেন। যা হোক, এবার বলুন, রাত সাড়ে দশটার পর আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে লোকেশ কোথায় গিয়েছিল।

একটু ইতস্তত করে বিনোদ বলল, আমায় কিছু বলে যায়নি।

প্রমোদ আর রাকেশ বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—আপনার সম্বন্ধীর কোন রোগ ছিল ? ব্লাডপ্রেসার টাইপের কোন রোগ ?

—আমি তো সেরকম কিছু শুনিনি।

পরিহার এবার রাকেশের দিকে তাকালেন।

—এবার আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন করি?

—বলুন?

—আপনিও কি এদের সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছিলেন?

—না। আমি গতকাল সকালে এলাহাবাদ থেকে এখানে এসেছিলাম। এক-জনের মুখে শুনলাম আমার বোন ব্যবসার কাজে পাটনায় এসেছে। গেলাম ওদের বাড়িতে। শুনলাম ওরা এয়ারপোর্ট চলে গেছে।

—আপনিও দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এখানে চলে এলেন?

—হ্যাঁ। অনেক দিন বোনের সঙ্গে দেখা হয়নি তাই এলাম।

—তারপর কি হল?

—হোটেলে এসে বিনোদবাবুদের সঙ্গে প্রথমে দেখা হল। ওরাই আমার জন্য ঘর বুক করলেন। তারপর আমি ঋতুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মিনিট পনেরো বোধহয় আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল।

—এই ঘর থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গেলেন?

—নিজের ঘরে। রাতভোর আমি ওখানেই ছিলাম।

—আপনাদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল?

—নিতান্তই পারিবারিক।

—আপনি মৃত লোকেশকে আগে থেকে জানতেন?

—জানতাম। আগে দেখা হয়েছে বার দুয়েক।

ভ্রূ কুঁচকে পরিহার এবার কি ভাবলেন।

—ঠিক আছে। এবার প্রমোদবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো।

প্রমোদ নড়েচড়ে বসে বলল, আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে ইন্সপেক্টার সাহেব। আপনি আমাদের এত প্রশ্ন করছেন কেন? লোকেশ হার্টফেল করে মারা গিয়ে থাকতে পারে?

—অবশ্যই পারে। তবে এই ধরনের ব্যাপারকে আমরা বাঁকা চোখেই দেখে থাকি। পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা সকলেই সন্দেহ-ভাজন। আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হবার পরই বডি চালান করে দেব। মনে হয় সন্ধ্যা নাগাদ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। এবার আপনার সন্দেহ হওয়ার অ্যাবাউটসটা বলুন?

—তেমন কিছুই নয়। ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে যাওয়ায় ভারী বিরক্ত বোধ করছিলাম। খাওয়াদাওয়ার পর ডাইনিং হল থেকে সোজা নিজের ঘরে ফিরে আসি। সারারাত ঘরেই ছিলাম।

—দুর্ঘটনার সংবাদ পেলেন কি ভাবে ?

—বেয়ারা গিয়ে খবর দিল। আমি মেজদা আর রাকেশবাবুকে তুললাম। তারপর তিনজনে এখানে চলে এলাম।

—লোকেশের এই ঘরে আসার কি কারণ থাকতে পারে বলতে পারেন ?

—আমার জানা নেই।

—আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশের সম্পর্ক কি রকম ছিল ?

এবার ঋতু বলে উঠল, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না।

পারহার বললেন, এখন কিছু বলবেন না। আপনার সঙ্গে পরে কথা বলছি। প্রমোদবাবু, প্রশ্নের উত্তরটা দিন ?

প্রমোদ বলল, কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমি জানি না। দুজনকে কখনও কথাবার্তা বলতে দেখিনি।

—এবার আপনারা নিজের ঘরে চলে যান। আমি মিসেস মাথুর আর মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই। ম্যানেজার সাহাব, আপনিও গিয়ে এবার নিজের কাজকর্ম করুন।

অনিচ্ছার সঙ্গে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরিহার সিগারেট ধরালেন এবার।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ম্যাডাম, দেখেশুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন ধনী মহিলা। নিজের সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

ঋতু নিজেকে এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক করে এনেছে।

শান্ত গলায় বলল, বছর ছয়েক আগে আমার স্বামী মারা গেছেন। তিনি একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া সমস্ত কিছু আমি পেয়েছি।

—সম্পত্তির পরিমাণ কি রকম ?

—আমার পাঁচখানা কলকাতা আর একখানা পাটনায় বাড়ি আছে। এ ছাড়া যৌথ এবং একক ব্যবসাও আছে।

—এ তো কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। এবার বলুন তো আসলে কি ঘটেছিল ?

—বিশ্বাস করুন, কি ভাবে কি ঘটেছে আমি নিজেই জানি না।

—আপনার বাথরুমে একজন লোক মরে পড়ে আছে, অথচ আপনি কিছু জানেন না ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

—মিথ্যাকথা বলছি না। সত্যি আমি কিছু জানি না। আমি তো মানে—

—বলুন ? কিছু লুকোবেন না।

একটু ইতঃস্তত করে ঋতু বলল, রাত্রে আমি ঘরে ছিলাম না ইন্সপেক্টার সাহেব। ভোর ছটার পর এখানে এসেছি। বেয়ারা তখন সঙ্গে ছিল।

—রাত্রে কোথায় ছিলেন ?

—মিঃ ব্যানার্জীর ঘরে।

—কটার সময় গিয়েছিলেন ওখানে ?

—রাত সাড়ে দশটার পর।

—আমি শুনলাম বহু বছর পরে আপনার সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জীর দেখা। এখন আপনি বিধবা, অথচ—

গাঢ় স্বরে ঋতু বলল, ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত। এ সম্পর্কে কারুর সঙ্গে আলোচনা করাটা আমার পছন্দ নয়। তবে এক্ষেত্রে—ব্যানার্জীর সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। এরপর আমাদের দুজনের জীবনে ঝড়ঝাপটা এল। এতদিন পরে গত সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হল আমাদের। আমরা কেউই কাউকে ভুলতে পারিনি ইন্সপেক্টার সাহেব। এবার আমরা নতুন জীবন আরম্ভ করতে চাই।

—হুঁ। একজন মহিলার মুখ থেকে এমন পরিষ্কার কথা এর আগে আমি শুনিনি। এনিওয়ে, আপনি তো বলছেন ঘরে ছিলেন না। লোকটা ঢুকলো কি ভাবে ?

—আমি চাবি বন্ধ করিনি। দরজা নরমাল ল্যাচে আটকানো ছিল।

—লোকেশ কেন আপনার ঘরে এসেছিল ? এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?

—সঠিক ভাবে বলতে পারবো না। তবে আন্দাজ করতে পারি।

—বেশ তো আপনার আন্দাজটাই শোনা যাক ?

—আমার দেওররা এবং আমার দাদা চান, আমার আবার বিয়ে হোক। এইভাবে জীবন কাটানো আমার উচিত নয়। বলা বাহুল্য এ সমস্ত আমার একেবারেই পছন্দের ব্যাপার নয়।

—আপনার বিয়ে করা না ওদের পাত্র পছন্দ করা, কোন্‌টে আপনার পছন্দ নয়।

—দুটোই। তখন তো জানতাম না, ব্যানার্জীর সঙ্গে নাটকীয় ভাবে দেখা হয়ে যাবে। আমার মেজ দেওর নিজের সম্বন্ধী লোকেশ ট্যাণ্ডনকে পাত্র ঠিক করলেন। এতে তাঁর সুবিধা অনেক। আমার পুরো সম্পত্তির ওপর উনি ছড়ি ঘোরাতে পারবেন। আমার আপত্তি আছে জেনেও ব্যাপারটাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছিল। মনে হয় লোকেশকে পাঠানো হয়েছিল আমার মনের গভীরতা মেপে

দেখতে। ভাগ্যক্রমে আমি সে সময় ঘরে ছিলাম না।

মনে মনে মহিলার তারিফ না করে পারলেন না পরিহার। বললেন, আপনাকে ঘরে না দেখে লোকেশের তো ফিরে যাবার কথা।

—উচিত তো তাই ছিল।

—তা হল না কেন? বাথরুমে ঐ ভাবে পড়ে থাকার কারণ কি?

কিছুটা অসহিষ্ণু ভাবে ঋতু বলল, আমি কি ভাবে জানবো? তদন্ত করার দায়িত্ব আপনার। এব উত্তর তো আপনি দেবেন।

—ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না প্রযোজন হলে পরে কথা হবে। মিঃ ব্যানার্জী এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই?

কুশল বলল, বেশ তো। কি জানতে চান বলুন?

পরিহার গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, মিসেস মাথুর বলছেন, উনি সারারাত আপনার ঘরে ছিলেন, কথাটা কি ঠিক?

—উনি ঠিকই বলেছেন।

—এটা কি সঙ্গতিপূর্ণ?

গলায় তীক্ষ্ণতা এনে কুশল বলল, এই ধরনের অবান্তর প্রশ্ন অর্থহীন। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্য কেউ মাথা গলাক এটা আমিও চাই না।

—লোকেশ ট্যাণ্ডনকে আপনি চিনতেন?

—না।

—আগে কখনও দেখেছেন?

—না।

- এই হোটেলে মিসেস মাথুরের যে কজন আত্মীয পরিজন উপাস্থত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাউকে চেনেন?

—ঋতুর বড ভাই রাকেশবাবু ছাডা আর কাউকে চিনি না।

—ঘটনাটা কি ভাবে ঘটল, এই সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?

—ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। ব্যাপারটা ভারী জটিল।

—জটিল তো বটেই। আপনি বা মিসেস মাথুর কোন কারণে গতরাত্রে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?

—না।

—কত রাত পর্যন্ত জেগেছিলেন?

—দুটোর কাছাকাছি ঘুমিয়ে ছিলাম।

—আপনারা দুজনেই বললেন লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনারা

কিছুই জানেন না—কথাটা ঠিক তো ?

—একশোবার ঠিক।

পরিহার এবার ঋতুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আর একটা প্রশ্ন আছে। আপনার দেওর এবং বড় ভাই ছাড়া আর কেউ সঙ্গে আছে ?

ঋতু ভ্রূ কুঁচকে বলল, আর কেউ ? ও হ্যাঁ, আমার ম্যানেজার ব্রজবাবুও কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছিলেন।

—তিনি কোথায় এখন ?

—মনে হয় করিডরেই আছেন। আপনাদের ভয়ে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। উনি নার্ভাস প্রকৃতির।

—এর অর্থ হল তিনিও এই হোটেলে রয়েছেন ?

—হ্যাঁ। ২২৭ নম্বর ঘরে আছেন।

—আর একটা কথা ম্যাডাম—

—বলুন ?

—আপনাকে অন্য ঘরের ব্যবস্থা দেখতে হবে। আমাদের কাজ শেষ হলেই এই ঘর শীল করে দেওয়া হবে।

—ঠিক আছে। আমি নিজের মালপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছি।

ঋতু এগিয়ে গিয়ে কলিং বেল পুস করল। পরিহার আর কিছু না বলে বাথ-রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ছবিটবি তোলা হয়ে গেছে। বডি পোস্টমর্টমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার তোড়জোড় চলেছে ওখানে। অন্যান্য কাজও মোটা-মুটি শেষ হয়ে এসেছে।

বেল শুনে বেয়ারা এসে পড়েছিল।

ঋতু বলল, সুটকেশ দুটো আর টুকিটাকি যে সমস্ত জিনিস রয়েছে, সমস্ত ২১০ নম্বর ঘরে গিয়ে রাখো।

বেয়ারা কাজে লেগে গেল।

কুশল দ্রুত গলায় বলল, এ কি করছো ?

—তুমি ঘাবড়ে গেলে ?

—তা নয়। আমরা একই ঘরে থাকলে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, তোমার দাদা ঝামেলা বাধাতে পারে।

ঋতু মিষ্টি করে হেসে বলল, ওরা জেনেছে, কাল রাত্রে আমরা একই ঘরে ছিলাম।

—আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি, এখন আমাদের আলাদা আলাদা ঘরে

থাকাই ঠিক হবে।

—এখন তো মালপত্রগুলো তোমার ঘরে ঢুকুক, তারপর না হয় যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

পরিহার সহকারীদের কিছু নির্দেশ দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে এসে দাঁড়ালেন। তখনও সেখানে বেশ কয়েকজন ঔৎসুক্য দাড়িয়ে রয়েছেন। ইন্সপেক্টারকে দেখেই পিছু হটলেন কয়েকজন।

পরিহার গলা তুলে বললেন, এখানে ব্রজবাবু আছেন?

একজন এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে, আমি ব্রজমোহন বর্মন।

— কিছু কথা আছে। আপনার ঘরে চলুন।

—২২৭ নম্বরে আছি। আসুন—

ঘরে এসে পরিহার বসলেন।

ব্রজবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন বিনীত ভঙ্গীতে।

—আমায় কিছু বলবেন বলছিলেন?

—হ্যাঁ। ভারী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে কি বলেন?

—সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। এমন যে এখানে ঘটবে ভাবাই যায়নি।

—আপনি কতদিন এদের এখানে চাকরি করছেন?

—তা বছর কুড়ি হবে।

পরিহার একটু হেলে বসে বললেন, তার মানে মাথুর সাহেবের আমল থেকে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি আমাকে চাকরি দিয়েছিলেন।

—আপনার কাজটা কি?

—কলকাতা আর পাটনায় অনেকগুলো বাড়ি আছে মেমসাহেবের। ভাড়া আদায় করি। প্রয়োজনে মেরামতের কাজ তদারক করি। ব্যবসার কাজেও মাঝেমধ্যে আমাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

—এই প্রথম এলেন, না, আগেও পাটনায় এসেছেন?

—মেমসাহেব যখনই পাটনায় আসেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

—বর্মনবাবু, এবার ভেবেচিন্তে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। এই পরিবারের ভেতরের ব্যাপারটা কি বলুন তো? ইতস্তত করবেন না, মনে রাখবেন, আপনি পুলিসের জেরার মুখে আছেন।

একটু থেমে, নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে বোধহয় ব্রজবাবু বললেন, পারিবারিক গোলমাল এঁদের দীর্ঘদিনের। সাহেব যখন বেঁচে ছিলেন, দুই ছোট ভাই ওকে সব সময় উত্যক্ত করার চেষ্টা করতেন। উনি মারা যাবার পর থেকে মেমসাহেবকে

কম ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে না। সবই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। মেজবাবু আর ছোট-বাবু দুজনেই ভারী লোভী। তবে মেমসাহেব শক্ত ধাতের মহিলা। ওঁকে কবজায় আনা সহজ কথা নয়।

—মারা গেছেন যিনি—লোকেশ ট্যাণ্ডনকে চিনতেন?

—চিনবো না! মেজবাবুর শালা। রঙীন মেজাজের লোক ছিল।

—ওর সম্পর্কে আপনি আর কি জানেন?

— ইদানীং একটা কথা কানে আসছিল, উনি নাকি মেমসাহেবকে বিয়ে করতে চান। আপনি বুঝতেই পারছেন স্যার, এ সমস্তই সম্পত্তি গাপ করার ষড়যন্ত্র।

—এ সম্পর্কে আপনার মেমসাহেবের মনোভাব কি?

—খুবই খারাপ। আমি স্যার সামান্য কর্মচারী। তবু উনি একদিন আমায় বলছিলেন—

—কি বলছিলেন?

—মেমসাহেব বলছিলেন, এরা ভাবেটা কি? আমি বোকা। একটা থার্ডক্লাস লোকের সঙ্গে আমি ঘর করবো? ব্রজবাবু, আপনি অ্যাটর্নীকে খবর দিন। পাকাপোক্তভাবে সমস্ত আলাদা করে নিই।

—কবে বলেছিলেন একথা?

—আজ্ঞে, পাটনাতেই। দিন তিনেক আগে।

পারিহার ব্রজবাবুকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললেন, এদিকের ব্যাপারটা বুঝলাম। এবার বলুন তো লোকেশ ট্যাণ্ডন আপনার মেমসাহেবের বথরুমে গিয়ে মারা পড়ল কি ভাবে?

চিন্তিত গলায় ব্রজবাবু বললেন, আমিও বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি স্যার। কোন কূলকিনারাই পাচ্ছি না।

—কাজটা আপনার মেমসাহেবের নয় তো?

—তা কি ভাবে সম্ভব স্যার? উনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাছাড়া এখনও তো বোঝা যায়নি, লোকেশবাবু কি ভাবে মারা গেছেন। হার্টফেলও করে থাকতে পারেন।

—তা পারেন। তবে হার্টফেল করার জায়গাটা আপনার মেমসাহেবের বাথরুমে কেন? এখানেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠেছে।

—আমি আর কি বলবো স্যার। এরমক ঘোরাল ব্যাপারের মুখোমুখি হলে আমার মাথা তেমন খোলে না।

—রাকেশ দিক্ষিত কেমন লোক?

—ভাল বলেই তো মনে হয়। মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে মাঝেমধ্যে আসেন। এলাহাবাদ আর পাটনায় ব্যবসা আছে।

—কুশল ব্যানার্জীকে চেনেন?

—আজই ওর নাম শুনলাম। এক ঝলক দেখেছিও।

—ওর সম্পর্কে আপনি কি কিছু শুনেছেন?

কিছু বলতে গিয়েও থামলেন ব্রজবাবু।

পরিহার এবার ধমকের সুরে বললেন, বলুন, কি শুনেছেন?

—আমি স্যার আদার ব্যাপারী—তবে, আপনি যখন জানতে চাইছেন বলছি শুনলাম মেমসাহেবের উনি নাকি পুরনো বন্ধু। গতরাত্রে দুজনে একই ঘরে ছিলেন—এই সব আর কি। আমি এ সমস্ত বিশ্বাস করি না।

—কার কাছ থেকে শুনলেন?

—কর্তারা আলোচনা করছিলেন, কানে এল।

—আপনার সঙ্গে মিসেস মাথুরের শেষ কখন দেখা হয়?

—ডিনারের পর উনি যখন ঘরে ফিরছিলেন।

—কি কথা হয়েছিল?

—তেমন কিছু নয়। শুধু—

—বলুন?

—উনি বলেছিলেন সাড়ে দশটার মধ্যে ওঁকে একবার ফোন করতে।

—নিশ্চয় ফোন করেছিলেন। কি কথা হয়েছিল?

দোনামনা করে ব্রজবাবু বললেন, ফোন করা হয়নি। আমি স্যার বিয়ার খেয়ে ফেলেছিলাম। অনভ্যাসের ফোঁটা। বিছানায় সেই যে পড়লাম, চোখ খুলল আজ সকালে। মেমসাহেব অবশ্য এই ধরনের বেয়াদপি পছন্দ করেন না।

পরিহার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এখন এই পর্যন্তই। প্রয়োজন হলে পরে আবার কথা বলা যাবে।

কথা শেষ করেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মুহ্যমান অবস্থায় খাটের ওপর এলিয়ে ছিল বিনোদ। রাকেশ দিক্ষিতের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। সে সোফায় বসে অবিরাম সিগারেট টেনে চলেছে। প্রমোদ উত্তর দিকের জানলার বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ।

দুশো ছাব্বিশ নম্বর ঘরের আবহাওয়া তখন থমথম করছে। পরিস্থিতির গতি যে এইরকম দাঁড়াবে কে ভাবতে পেরেছিল। বিশেষ করে কলকাতার

বাইরে। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে পুলিস সহজে কাউকে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

ইন্সপেক্টার জানিয়ে গেছেন, রিপোট না পাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ পুলিসের অনুমতি না পেয়ে কেউ পাটনা ছাড়তে পারবেন না। এয়ারলাইন্সের কর্তৃপক্ষকেও এ কথা জানিয়ে রাখা হয়েছে। আশার কথা, বিশেষ ব্যবস্থায় আজ সন্ধ্যার মধ্যেই পোস্ট-মর্টমের রিপোর্ট পাওয়া যাবার সম্ভাবনা।

বিনোদ উঠে বসে মনমরা গলায় বলল, আমি ভারি অন্যায় করেছি। লোকেশকে এখানে না নিয়ে এলে কখনই মারা যেত না।

জানলার কাছ থেকে সরে এসে বলল, এখন হা-হুতাশ করে কি করবে? এই ভাগ্যকে তো আর খণ্ডানো যাবে না?

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছো। কিন্তু আমার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে ভেবে দেখেছো একবার?

—কিসের অবস্থা?

—শ্বশুরবাড়িতে আমি কখনও মুখ দেখাতে পারবো? ওঁরা সকলেই লোকেশের মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করবেন।

—তুমি একটু বেকায়দায় পড়েছো ঠিকই। তবে করার কি থাকতে পারে বল না? ভাল কথা, তোমার শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে?

বিমর্ষভাবে মাথা হেলিয়ে বিনোদ বলল, হ্যাঁ। ফোনে প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম, লাইন পাওয়া গেল না। অগত্যা তার করতে হল।

—সময়মত তার পেলে ওঁরা কাল দুপুর নাগাদ চলে আসবেন। তার মধ্যেই আমরা পুলিসের কাছ থেকে ডেডবডি পেয়ে যাবো।

—আমার ঝামেলা তো ওখানেই। ওঁরা এসে পড়ার পর আমার অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে সেই কথা ভেবেই তো কাহিল হয়ে পড়েছি প্রমোদ।

—করার তো কিছু নেই। সব ঝড়ঝাপটা সহ্য করে যেতেই হবে।

এতক্ষণ পরে রাকেশ কথা বলল, তোমরা একটা বিষয় নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করছো না।

—কোন বিষয়?

প্রমোদের প্রশ্নের উত্তরে রাকেশ বলল, পোস্টমর্টমের রিপোর্টে যদি জানা যায় লোকেশের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

বিনোদ দ্রুত গলায় বলল, তা কি ভাবে সম্ভব? আমরা না জানলেও, লোকেশ নিশ্চয় হার্ট পেশেন্ট ছিল।

—হার্ট ফেল করে লোকেশ যদি মারা গিয়ে থাকে তবে তো মিটেই গেল। তা যদি না হয়ে থাকে—আমরা ভীষণ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব।

দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

—আপনি বলতে চাইছেন,—বিনোদ বলল, লোকেশ খুন হয়েছে?

রাকেশ সিগারেটের টুকরোটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, আমি ব্যাপারটার ওপর জোর দিচ্ছি না। সম্ভাবনার কথা বলছিলাম।

—সম্ভাবনার কথা ছাড়ুন। যা হবার হবে। মনকে আর অকারণে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না।

—এক দিক থেকে কথাটা ঠিক। সাড়ে ছটা বাজল। রিপোর্ট তৈরী থাকলে ইন্সপেক্টার যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

—রাকেশবাবু—

—বলুন?

প্রমোদ বলল, আমি অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলতে চাই। এখন, এই দুঃসময়ে আমাদের কাছাকাছি বৌদির থাকা উচিত ছিল, নয় কি?

—আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে—

—হঠাৎ ওঁর মনমেজাজ এমন বিগড়ে গেল কিভাবে বোঝা যাচ্ছে না। একটা স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গে আঠার মত জুড়ে আছেন, ভাবা যায় না।

—ওর কাণ্ডকারখানায় আমি হতবাক। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা। আমি কিছুই করতে পারছি না।

বিনোদ বলল, ছেলেমানুষের মত কথা বলবেন না। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমাদের বৌদি আপনার বোন। দায়িত্ব আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না।

প্রমোদ বলল, আমাদের পারিবারিক সম্মান ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। বৌদি যে নিজেকে এত সস্তা করে ফেলবেন আগে কে ভেবেছিল। এখন আপনি সবদিক রক্ষা করতে পারেন। ভেবে দেখুন আপনার এখন কি করণীয়।

চিন্তিত গলায় রাকেশ বলল, আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করতে পারি বলুন? ঋতুর আমি গার্জেন নই। কিছু বলতে গেলে সে আমাকে তোয়াক্কার মধ্যে আনবে না

—ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। যা হবার হয়ে গেছে। এবার বৌদিকে বাধা দিতেই হবে।

—কি ভাবে বলুন?

দুই ভাইয়ের কপালে এবার চিন্তার রেখা ঘন হয়ে এল।

—ওদিকে—

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কুশল দাড়ি কামাচ্ছিল। নানা ঝামেলার দরুন সময়মত দাড়ি কামানো সম্ভব হয়নি। এখন কাজটা সেরে নিচ্ছে। ঋতু বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ওর সুশ্রী মুখের উপর আশঙ্কার ছায়া।

—বেশ—

—কি হল?

—আমার ভীষন ভয় করছে। লোকটা মরার আর জায়গা পেল না!

—লোকটা কিন্তু সত্যি অদ্ভুত। লোকটার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে থাকে তবে ভয়ের কিছু নেই।—একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তোমার বাথরুমে কি করতে ঢুকেছিল?

—চান করার জন্য। তুমি দেখ নিও, লোকেশ ট্যাণ্ডন স্বাভাবিক ভাবে মরেনি।

—এক-এক সময় আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—কি হবে? আমি তো—

তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে এগিয়ে এসে কুশল বলল, কেন আজবাজে কথা ভাবছো। আমি তো রয়েছি।

ফিকে হেসে ঋতু বলল, ভাবতেও আমার ভাল লাগে এখন। কতদিন পরে আজ আমি তোমাকে নিজের পাশে পেয়েছি।

—আমার খুশীর গভীরতা কিভাবে তোমাকে বোঝাব! আমার কি মনে হচ্ছে জান—

—কি মনে হচ্ছে বল না—?

বলা আর হল না।

মিষ্টি সুরে বেল বেজে উঠল।

ভ্রূ কুঁচকে উঠল দুজনের। মনের আনাচেকানাচে বিরক্তির খোঁচালাগা স্বাভাবিক। এখন আবার কে এল? শান্তিতে কথাবার্তা বলার সুযোগও তাদের নেই। কুশল এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মন আশঙ্কায় ভরে গেল। চৌকাঠের ওধারে বিনোদ, প্রমোদ এবং রাকেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা-বাহুল্য তিনজনের মুখ অসম্ভব গম্ভীর।

রাকেশ কুশলকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল।

ঋতু একই ভাবে খাটের উপর বসে রয়েছে।

—এ সমস্ত কি হচ্ছে ?

ঋতু কোন উত্তর দিল না।

রাকেশ এবার ফেটে পড়ল।

—আমি জানতে চাই এ সমস্ত কি হচ্ছে ?

—আমিও জানতে চাই—ঋতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, পরের ঘরে এসে এত হম্বি-তম্বি করছো কেন ? সভ্যতার পাট কি একেবারে চুকিয়ে ফেলেছো ?

—বেহায়াপনার একটা সীমা থাকা উচিত। এই পরের ঘরে তুমি কি করছো ? দুটো পরিবারের মুখে কালির ছোপ লাগাতে তোমার সঙ্কোচ হল না ?

—একটা বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে একটা বুড়ো লোকের বিয়ে দেওয়ার সময় তোমাদের সঙ্কোচ হয়নি ? আর এঁরা—এঁদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু আছে ? আমার সমস্ত কিছু হাতাবার জন্য মরিয়া হয়ে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছেন। আমাকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই দাদা। কেঁচো খুঁড়তে চেয়েছিলে—সাপ কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে।

—তোমাব ভুল ধারণা বৌদি। তোমার বিষয়সম্পত্তির ওপর আমাদের কোন লোভ নেই। অকারণে কেন দোষ দিচ্ছ ?

দুই ভাই তখন ঘবেব মধ্যে।

বিনোদের কথা শুনে ঋতু বলল, অ্যাটর্নী অনেক কিছুই ফাঁস কবে দিয়েছে। বলুন, শুনতে চান সে সমস্ত কথা ?

অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে প্রমোদ বলল, বিষয়সম্পত্তির কথা এখন থাক। আপনার প্রতি অনেক অবিচার হযেছে তাও মেনে নিলাম। তবু বলবো, আমাদের পরিবারের মানসম্মান এই ভাবে নষ্ট করবেন না।

—আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই নেই ? আমাকে আজীবন সমস্ত অবিচার সহ্য করে যেতে হবে দুই পরিবারের মেকী সম্মান রক্ষা করার জন্য ? সম্ভব নয়। আপনাদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই, কোন সম্পর্কের বন্ধন আর নেই। এখন থেকে আমার ভবিষ্যতের দায় আমার নিজের হাতে। আমার কোন ব্যাপারে আপনাদের দেখতে হবে না।

—কিন্তু বৌদি—

—বৌদি নয়। আমার নাম আছে। নিতান্তই যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আমার নাম ধরে ডাকুন।

—আপনি কি সমস্ত বলছেন ? আপনার ভবিষ্যৎ—

—বললাম তো, আমার হাতে। ভবিষ্যতে পা কি ভাবে ফেলবো, তাও স্থির

করে ফেলেছি। আমি সহজ এবং স্বাভাবিক জীবন চাই। আমি প্রাণভরে বাঁচতে চাই। তাই আমি মিসেস ব্যানার্জী হাত চেয়েছি।

—ঋতু !!!

রাকেশ ফেটে পড়ল।

—কি পেয়েছো এই লোকটার মধ্যে। একটা ইডিয়েট, একটা স্কাউণ্ড্রেল—সামান্য একটা মাইনর স্কুল-মাস্টারের ছেলে—

—রাকেশবাবু,—কুশল গম্ভীর গলায় বলল, আমার স্বর্গীয় বাবাকে এখানে টেনে আনবেন না।

—একশবার আনবো। কি করবে তুমি?

—কি ধরনের ট্রিটমেণ্ট চাইছেন?

—ট্রিটমেণ্ট। আমাকে চ্যালেঞ্জ করছো? এতবড় সাহস! তুমি জান না, আমি ইচ্ছে করলে—

—তোমাকে আমি জানি দাদা—ঋতু বলল, তুমি ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারবে না। মনে রাখার চেষ্টা করো, আমি এখন ব্যানার্জীর দিকে।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? ভুলে গেছো তুমি বিধবা—তোমার এই বাচালতা তোমাকে কত ছোট করে দিচ্ছে তা তোমার একবারও মনে পড়ছে না?

ঋতু দ্রুত গলায় বলল, কেন মনে পড়বে? লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে যখন আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছলে তখনও আমি বিধবা ছিলাম? ঐ বিয়েতে সম্মতি দিলে, আমার বাচালতা প্রকাশ পেত না? তুই পরিবারের সম্মান নষ্ট হত না, এই কথাই কি বলতে চাইছো?

বিনোদ বলল, অনেক হয়েছে, আর নয়। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, লোকেশকে এরাই দুনিয়া থেকে সরিয়েছে।

প্রমোদ বলল, তুমি ঠিক বলছো মেজদা। নিজেদের পথ পরিষ্কার করার জন্য এরা লোকেশকে মেরে ফেলেছে।

রাকেশ বলল, আমারও এখন তাই সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ আর প্রমাণ এক কথা নয় দাদা।—ঋতু বলল, আর কিছু নিশ্চয় বলার নেই? অবশ্য বলার থাকলেও আমরা আর শুনতে চাই না। তোমরা এবার যেতে পারো।

—ঠিক আছে। তবে শেষ রক্ষা করতে পার কিনা দেখ।

রাকেশ কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আগুনঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বিনোদ বলল, আপনার নৈতিক মান যে

এত নীচুতে আমরা জানতাম না। তবে মনে রাখবেন, আজকের অপমান কোনো মতেই ভুলবো'না। এস প্রমোদ।

দুই ভাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ঋতু কুশলের দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে অসহায়তা ছাপিয়ে এসেছে। কুশল এগিয়ে গেল। ওর কাঁধে আলতোভাবে হাত রাখল। ঋতু দৃষ্টি মেলাতে পারছে না। কিছু একটা বলতে গিয়ে থামল, তারপর কুশলকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আন্দাজ রাত সওয়া নটার সময় ইন্সপেক্টার পরিহার সদলবলে হোটেলে প্রবেশ করলেন। পোস্টমর্টমের রিপোর্ট ঘণ্টাখানেক আগে পেয়েছেন। প্রথামত পাটনার সদর এস পি.র সঙ্গে তাঁর কিছু কথাবার্তা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে তবেই এসেছেন এখানে।

হোটেলে ঢুকেই তিনি ম্যানেজারের ঘরে চলে গেলেন। কি সমস্ত কথাবার্তা হল দুজনের মধ্যে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, লিফটের সাহায্য না নিয়েই সিঁড়ির দিকে এগুলেন। কেন যে নিজের স্থূল শরীরকে কষ্ট দিতে চাইলেন বোঝা গেল না। সঙ্গে ম্যানেজারও আছেন।

সেকেণ্ড ফ্লোরে পৌছবার পর পরিহার বেশ হাঁপিয়ে পডলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিয়ে নাক ঝেড়ে নিলেন সশব্দে, তারপর ম্যানেজারের দিকে তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। ম্যানেজার এবার সেনাপতির ভূমিকা নিয়ে সকলের আগে এগিয়ে গিয়ে নক করলেন ২১০ নম্বর ঘরে।

দরজা খুলে গেল।

গম্ভীর মুখে পরিহার ঘরে প্রবেশ করলেন। পিছনে আর সকলে। ঋতু খাটের উপর বসে ছিল আগেকার মতই। কুশল ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুজনের মুখেই ঘনায়মান আশঙ্কা। পরিহার দ্রুত চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে খাটের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন।

বললেন, পোস্টমর্টমের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। লোকেশ ট্যাণ্ডনের পেটে মারকিউরিক ক্লোরাইড ছিল।

ওরা কিছু বলল না।

উনি আবার বললেন, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। এটা মার্ডার কেস।

কুশল বলল, আত্মহত্যাও হতে পারে।

—না, পারে না। কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলে, অসময়ে পরের ঘরে—

বিশেষ কোন মহিলার ঘরে গিয়ে ঢোকে না। বাথরুমে গিয়ে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকে না। কাজেই এটা মার্ডার কেস। মিসেস মাথুর, আপনি কিছু বলবেন ?

ঋতু অসংলগ্ন গলায় বলল, আমি আর কি বলবো ?

—তাহলে এবার আমিই আসল কথাটা বলি।

পরিহার নিজের শরীরকে একটু হেলিয়ে দুলিয়ে নিলেন।

লোকেশ ট্যাণ্ডনকে হত্যা করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ওয়ারেণ্ট সঙ্গে আছে দেখতে পারেন। অবশ্য আপনাকে হ্যাণ্ডকাপ পরানো হবে না। লেডি কনস্টবল বাইরে অপেক্ষা করছে।

এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ঋতুর কপালে ঘাম দেখা দিল।

—সে কি ! আমাকে—

নিজের অসহায়তা কাটিয়ে নিয়ে কুশল বলল, শুধু সন্দেহ করছেন না, ওঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে ?

—যা আছে কোর্টে আমরা দাখিল করবো। এখন বলতে বাধ্য নই। আপনি তৈরী হয়ে নিন মিসেস মাথুর। বানওয়ারী—

একজন এগিয়ে এসে বলল, স্যার—

—গিরিজা দেবীকে ডাকো।

ঋতু কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে কুশলের হাত চেপে ধরল।

—বেঞ্জ—

—নিজেকে শক্ত করো ঋতু।

—কি হবে এখন ?

—দেখছি কি করা যায়।

কথা শেষ করেই কুশল ঘুরে দাঁড়াল।

—ইন্সপেক্টার, উনি একজন সম্মানিতা মহিলা আজ রাত্রে ওঁকে থানায় নিয়ে যাবেন না। এই ঘরেই রাখুন। পাহারা বসিয়ে দিন। কাল সকালে আইনজ্ঞর সঙ্গে পরামর্শ করি, তারপর না হয়—

পরিহারের মুখে বিজ্ঞের হাসি দেখা দিল।

—তা হয় না। আইনের চোখে সকলেই সমান। থানার লকআপ আরামদায়ক নয়, একথা সকলেই জানে। তবে যতদূর সম্ভব সুযোগ-সুবিধে ওকে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে মধ্যবয়স্ক লেডি কনস্টবল ঘরে এসে গিয়েছিল।

—মিসেস মাথুর, এবার যেতে হবে।

ঋতুর চোখ ফেটে জল আসছিল। কুশলের মুখ কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখের উপর আঁচল বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করল।

কোন রকমে বলল, যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, আমাকে যেতেই হবে। তুমি—

—আমি কালই বেল-এর ব্যবস্থা করছি। কুশল বলল, ইন্সপেক্টার অবশ্য একটা সুযোগ দিতে পারতেন। তবে—

—ওঁকে অনুরোধ জানানো বৃথা। তুমি আছো, এই আমার পক্ষে অনেক। ব্রজবাবুকে সঙ্গে রেখো—কাজের লোক।

পরিহার বললেন, মিঃ ব্যানার্জী, আমাদের অনুমতি ছাড়া আপনি এখন পাটনা ছাড়বেন না। সন্দেহের তালিকায় আপনাকেও রাখতে হয়েছে।

—বরং আমাকেই অ্যারেস্ট করুন। ওঁকে ছেড়ে দিন। ওঁকে বরং সন্দেহের লিস্টে রাখুন।

—ছেলেমানুষী করবেন না। আপনার নামে এখনও ওয়ারেণ্ট ইস্যু হয়নি। এবার যাওয়া যেতে পারে।

ঋতু কুশলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে এগুলো।

করিডরে তখন বোর্ডারদের ভীড় হয়ে গেছে। একজন অভিজাত মহিলা খুন করার দায়ে অ্যারেস্ট হয়েছেন, এমন ঘটনা বারবার ঘটে না। তাও আবার দামী এবং নামী হোটেলে। ব্রজবাবু দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিস তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। মেমসাহেবের এই বিপাকের দরুন তিনি ভারী বিমর্ষ।

ঋতুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নাক মুখ থেকে যেন গরম ভাপ বেরুচ্ছে। তবু সংযত পায়ে করিডর মাড়িয়ে এগিয়ে চলল। রাকেশ এগিয়ে এসে ইন্সপেক্টরকে কিছু বলল। উনি মাথা নাড়লেন। বিনোদ আর প্রমোদ নিজের নিজের ঘরের সামনে নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এরকম একটা কিছু যে হবে তা যেন আগেই জানা ছিল।

কুশলও গেল পিছু পিছু। মনের মধ্যেকার হাহাকার ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গাড়িবারান্দায় এসে ঋতুকে জীপে বসানো হল। জীপ রওয়ানা হয়ে গেল তারপরই। কুশল ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আবার উপরে এল। ব্রজবাবু কেমন হাঁকপাঁক করছেন।

—এখানকার কোন ভাল উকিলকে চেনেন?

ব্রজবাবু বললেন, ইনকামট্যাক্সের উকিল ব্রিজেশ শ্রীবাস্তবকে জানি। উনি আমাদের কাজটাজ দেখেন।

—ক্রিমিনাল সাইডের কাউকে চেনেন কিনা জানতে চাইছি?

—না, স্যার। তেমন তো কেউ—

—ঠিক আছে। আমি অন্যভাবে চেষ্টা করছি। আপনার মেমসাহেবকে যে কোন মূল্যে বাঁচাতে হবে। আপনি আমার ঘরে আসুন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে।

ঘরে ঢোকার মুখেই রাকেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রাকেশের গলায় উত্তেজনা।

—তোমার হঠকারিতার দরুনই ঋতু এইভাবে ফেঁসে গেল।

—আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

—তা চাইবে কেন? এই কাজটা তোমার। ঋতুকে পাবার জন্য তুমি পথের কাঁটা এইভাবে সরিয়েছো।

কুশলের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

—অনেক বড বড ইডিয়ট দেখেছি, কিন্তু এরকম দেখার সুযোগ হয়নি। ঋতুকে পাবার জন্য ওর দিকে ফাঁসির দড়ি এগিয়ে দিলাম। চমৎকার। পুলিস আমাকে সন্দেহের লিস্টে রেখেছে। পুলিসের কাছে বলুন গিয়ে নিজের কথা। এরকম সাক্ষী পেলে ওরা দু হাত তুলে নাচবে।

কথা শেষ করেই কুশল ঘরে ঢুকে গেল।

ব্রজবাবুও গেলেন পিছু পিছু।

অপমানে রাকেশের মুখ কালো হয়ে উঠেছে।

ঘরে গিয়েই কুশল রিসিভার তুলে নিল।

—হ্যালো—এক্সচেঞ্জ—

—এক্সচেঞ্জ—

—৫৪৮০০—লাইনটা একটু তাড়াতাড়ি দেখুন—

রিসিভার নামিয়ে রেখে কুশল বলল, আমাদের পাটনা ব্রাঞ্চের সুপারভাইজার গৌতম চৌহানের সঙ্গে কথা বলে দেখছি। চৌহান নিশ্চয় ভাল উকিলের ব্যবস্থা করে দেবে।

—মেমসাহেবকে এই ঝামেলা থেকে বের করে আনতে সমস্ত কিছু করতে হবে। কি দুর্বিপাক বলুন তো স্যার? কষ্ট কাকে বলে উনি জানেন না। অথচ আজ—

ব্রজবাবুর কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে নিল কুশল।

—হ্যালো—চৌহান, ব্যানার্জী কথা বলছি—

ওধার থেকে চৌহানের গলা ভেসে এল, স্যার, আপনার তো কলকাতা ফিরে যাবার কথা—এখনও রয়েছেন—অথচ—

—যাওয়া হয়নি—একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি—তোমাকে এই অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ভারী দুঃখিত—ক্রিমিনাল সাইডের কোন ভাল উকিলকে তুমি চেনো?

—কয়েকজনের সঙ্গে চেনাজানা আছে— স্যার, কেসটা কি—

—মার্ডার কেস—আমার এখন দরকার ভাল বেল মুভার—

—বসন্ত সান্যালকে দিয়ে কাজটা করানো যেতে পারে। বেল নেওয়ার ব্যাপারে ওর বেশ সুনাম আছে। আমি তো স্যার কিছুই বুঝতে পারছি না—যদি অনুমতি করেন তবে এখনই আপনার কাছে পৌছতে পারি—কোথায় রয়েছেন এখন—

—তুমি নয়—আমি আসছি তোমার কাছে—

কুশল রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—চলুন, ব্রজবাবু, কাজে নেমে পড়া যাক।

তখন রাত এগারটা দশ।

রাজেন্দ্রনগরের সুদৃশ্য এক দোতলা বাড়ির সামনে অফিসের গাড়ি থেকে নামল কুশল। সঙ্গে চৌহান এবং ব্রজবাবু। বসন্ত সান্যালের সঙ্গে ফোনে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে নেওয়া হয়েছিল। সময় অবশ্য অনুকূল নয়, তবে অভিজ্ঞ সান্যাল বোঝেন মক্কেলের মনস্তত্ত্ব।

বেল শোনার পর, ড্রেসিংগাউন পরিহিত গৃহস্বামী স্বয়ং দরজা খুললেন। ভাবী মক্কেলদের সাদরে নিয়ে গিয়ে বসালেন অফিস রুমে। পরিচয় ও অন্যান্য দু-চার কথার পর, আসল ঘটনায় কেন্দ্রীভূত হলেন সকলে। মন দিয়ে সমস্ত কথা শুনলেন সান্যাল। যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি সমেত সমস্ত কথা বলে গেল কুশল। এমন কি ওর এবং ঋতুর বর্তমান সম্পর্ক কি তাও উল্লেখ করতে ভুলল না।

সান্যাল মিনিট খানেক ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, নিয়ম অনুসারে পুলিস প্রথমে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করবে। মিসেস মাথুরকে ওখানেই আমরা 'বেল' মুভ করবো। অবশ্য 'বেল' নাকচ হবে। এ সবই প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার।

—তাহলে তো—

—ব্যস্ত হবেন না। আরেক প্রস্থ কাগজপত্র তৈরী থাকবে। নাকচ হবার পরই আমরা ডিস্ট্রিক্ট জাজের এজলাসে আবেদন করবো। ওখান থেকে নিশ্চিত ভাবে

'বেল' পেয়ে যাবো।

—আপনি স্যাঙ্গুইন হচ্ছেন কি ভাবে ?

সান্যাল হাসলেন।

—এই ভাবে নিশ্চিত হবার পিছনে আমার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে মিঃ ব্যানার্জী। এখনও আমি পুলিসের বক্তব্য জানি না। তবু বলছি। কারণ এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে। আসামী শুধু মহিলাই নয়, অভিজাত ঘরেরও।

কুশল বলল, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বেল নাকচ করবেন এ সম্পর্কে যখন নিশ্চিত তখন প্রথমেই ডিষ্ট্রিক্ট জাজের ওখানে গেলেই তো হয়।

—তা হয় না। নিয়মানুসারে সি. জে. এম.-এর কাছে প্রথমে যেতেই হবে। আর একটা কথা—

—বলুন ?

—পুলিস আপনাকে সন্দেহ করছে। হয়তো কালই কোন সময় অ্যারেস্ট করবে। প্রথম সুযোগেই তাই ডিফেন্স নিয়ে রাখা ভাল।

—কি ধরনের ডিফেন্সের কথা বলছেন ?

—অ্যান্টিসিফেটরী বেল। আমাদের আবেদনে যদি বিচারপতি সম্মতি জানান তবে পুলিস আপনাকে ছুঁতে পারবে না।

—যদি বলছেন কেন—

—এই ধরনের বেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। আমরা অবশ্য জোর চেষ্টা করবো। নিতান্তই যদি নাকচ হয়, হাইকোর্ট রয়েছে। ওখানে কোন ভাল বেঞ্চ দেখে আবেদন করতে হবে।

—ব্যাপারটা তাহলে—

—আপনি চিন্তিত হবেন না মিঃ ব্যানার্জী। আমার পরিশ্রম আর অভিজ্ঞতা দেখুন না, ব্যাপারটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। কাগজপত্র আমি সব ঠিক করে রাখবো। আপনারা বরং সকাল সাড়ে আটটার সময় আসুন।

কুশল উঠে দাঁড়াল।

দশটা একশো টাকার নোট টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, কত খরচ হবে আমার জানা নেই। এখন হাজার টাকা রেখে যাচ্ছি। কাল হিসেব পেলে বাকী টাকা মিটিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ।

—আরেকটা কথা মিঃ সান্যাল—

—বলুন ?

—আমার অ্যান্টিসিপেটারি বেল অ্যাপ্রুভ না হলে কোন ক্ষতি নেই। ঋতুর কিন্তু হওয়া চাই।

—হবে। আপনার সম্পর্কে আমি যে নিরাশ, তা নয়। দেখুন না, শেষ পর্যন্ত কি হয়। তাহলে ঐ কথাই রইল।

উনিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে যথানিয়মে 'বেল' রিজেক্ট হল। ঋতুর চেহারা বাসী ফুলের আকার নিয়েছে। ও বার বার তাকাচ্ছিল কুশলের দিকে। হাকিম বেল নাকচ করে ওকে জেলে পাঠাবার আদেশ দিলেন। পুলিসের পক্ষ থেকে চারদিনের জন্য 'রিমাণ্ড'-এর আবেদন করেছিল। সে আবেদনও খারিজ করা হল। এই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল, 'রিমাণ্ড'-এর আবেদন ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে পুলিস পক্ষ করতে পারেন।

পূর্বব্যবস্থা মত 'বেল' পিটিশন সান্যাল জমা দিলেন ডি. জে.র এজলাসে। কুশলের পিটিশন আগেই জমা পড়ে গিয়েছিল। লাঞ্চের পর শুনানি আরম্ভ হল। জেলা জজের বিশাল কক্ষ জনাকীর্ণ। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় 'লোকেশ ট্যাণ্ডন মার্ডার' সংক্রান্ত খবর ছাপা হয়েছিল। কাজেই সাধারণের মধ্যে আগ্রহ জাগবেই। বিশেষ একজন বিধবা, সুরূপা মহিলা এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।

ঋতুকে এবার কোর্টে আনা হয়নি। ওকালতনামাতে ওর সাক্ষর আছে কাজেই উপস্থিতি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। বিনোদ, প্রমোদ এবং রাকেশও উপস্থিত রয়েছে। কুশল সবিস্ময় লক্ষ্য করল ঋতুর মা ও বাবাও এসে পড়েছেন।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওঁরা এলেন কি ভাবে? মনে হয় রাকেশ রাত্রেই ট্রাঙ্ক করেছিল ওঁদেব। সকালে নিশ্চয় কোন ফ্লাইট আছে। ওতেই চলে এসেছেন দুজনে। সান্যাল ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সরকারী উকীলকে পিটিশনের নকল দেওয়া হয়েছে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

'বেল' হয়ে গেল ঋতুর। কুশলেরও।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে কুশল ছুটল পাটনা সেণ্ট্রাল জেলের দিকে। এমন কি সান্যালকে ধন্যবাদও জানানো হল না। জেলে গিয়ে সমস্ত নিয়মকানুন মেনে ঋতুকে বার করে আনতে ঘণ্টাখানেক আরো লাগল।

বিপত্তি ঘটল এরপরই।

ঋতু উচ্ছ্বসিত। কুশলের কার্যকারণে ওর বুক ফুলে উঠছে। কিন্তু সব উচ্ছ্বাস নিভে গেল জেল গেট পার হবার পর। মা ও বাবাকে দেখে একেবারেই ভাল লাগল না। ওঁরা একটা ফিয়েট গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিনোদ প্রমোদ এবং রাকেশও রয়েছে।

মা এগিয়ে এলেন। বাবাও।

মেয়ের গাল টিপে মা বললেন, খবর পাবার পর যে কি দুশ্চিন্তা হয়েছিল বলার নয়। এমন ঝামেলায় কেউ পড়ে?

ঋতু নিস্পৃহ গলায় বলল, ঝামেলায় আমি পড়িনি মা। ঝামেলায় আমাকে ফেলা হয়েছে।

—ওকথা এখন থাক। শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে। এখন তোমার বিশ্রামের দরকার। চল, যাই এবার।

বাবা বললেন, কেসটা ভাল করে লড়তে হবে। উকিল-টুকিলের ব্যবস্থা আজ সন্ধ্যার মধ্যে করতে হবে।

—তোমরা ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামিও না।

—সে কি! কি বলছো কি? আমরা ছাড়া মাথা ঘামাবে কে? কর্মচারীদের দিয়ে এ সমস্ত কাজ হয় না।

ঋতুর গলায় এবার দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—একটা কথা জানতে চাই বাবা? তোমরা কি এখানে মজা দেখতে এসেছিলে?

—কি বলছো আজেবাজে। চল, যাওয়া যাক। পরে—

—পরে নয়, এখনই। ভাল ভাবে কেস লড়তে চাও, অথচ 'বেল' মুভ করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখালে না? আমার 'বেলার' কে হবে তা নিয়ে তোমাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না! এখন ভালবাসা উথলে উঠছে।

—তুমি চাইছোটা কি?

—আমি কি চাইছি, তোমার অজানা নয়। দাদা তোমাদের সব কথাই বলেছে আমি জানি। স্বচ্ছন্দে তোমরা আমাকে খরচের খাতায় লিখে নিতে পারো।

রাকেশ মুখ অন্ধকার করে এগিয়ে এল।

—প্রত্যেক ব্যাপারের একটা সীমা থাকা উচিত।

—এখানে সিনক্রিয়েট করো না, এটা তোমাদের কোর্টইয়ার্ড নয়।

কথা শেষ করেই ঋতু অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুশলের দিকে তাকাল।

—তুমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছো। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চল, এবার যাই। ব্রজবাবু, আমরা এগুচ্ছি। আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা দেখুন।

কয়েক জোড়া স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঋতু কুশলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল। কে বাধা দেবে? আইন তাহলে হাতে নিতে হয়।

কুশল বলল, তুমি যে এত বেপরোয়া হতে পারো, না দেখলে কখনই বিশ্বাস করতাম না।

—তুমি আমাকে বেপরোয়া করে তুলেছো।

—আমি।

—হ্যাঁ, বেশ তুমি। হারিয়ে যাওয়া কিছু ফিরে পাবার পর, সাহসী আর বেপরোয়া হতেই হয়, নইলে ভয় থাকে আবার হারিয়ে যাবার। ভারী মিষ্টি হাসি দেখা দিল ঋতুর মুখে।

এরপর সাড়ে চার মাস কেটে গেছে।

পুলিস চাজসিট দাখিল করেছে কোর্টে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ১২০ বি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে ঋতুর বিরুদ্ধে। অর্থাৎ হত্যা এবং ষড়যন্ত্র। বিস্ময়ের বিষয় সহযোগী হিসাবে কুশল বা আর কারুর নাম দেওয়া হয়নি। এবার এই মামলা নিয়মানুসারে সেসান কোর্টে চলবে।

পরওয়ানা পাওয়া গেছে।

এগারই মে ঋতুকে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের এজলাসে উপস্থিত হতে হবে। ঋতুকে ডিফেন্স দেওয়ার জন্য সান্যাল অবশ্য আদালতে উপস্থিত থাকবেন না। তাঁর পরামর্শেই ক্রিমিনাল সাইডের ব্যবহারজীবী নরেন্দ্র আহুজাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আহুজা সাহেব কেস বুঝে নিয়েছেন।

এবং ভরসা দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে ঋতু ও কুশলের ব্যক্তিজীবনে মধুর পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ জনচারেক পরিচিতদের নিয়ে ওরা একদিন কলকাতার এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। অনাড়ম্বর ভাবে বিয়ে হয়ে গেছে দুজনের। বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়িকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ঋতু গিয়ে উঠেছে কুশলের ছোট ফ্ল্যাটে।

এত আনন্দের মধ্যে কিন্তু আশঙ্কার কীট দুজনকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। আইনজ্ঞ মোটামুটি ভরসা দিয়েছেন। তবু মন মানতে চাইছে না। খুনের মামলা

বলে কথা—আদালতের কার্যক্রমে কত বিপরিতধর্মী পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। তখন—কি হবে তখন?

অবশ্য হাইকোর্ট আছে। আছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত

আদালত আরম্ভ হবার পরই ঋতুর ডাক পড়ল। বিচারপতি নিজে চেম্বারে এসে কয়েক মিনিট আগে বসেছেন। জনাকীর্ণ আদালত গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। ঋতুর শরীর ঝিমঝিম করছিল। কুশল তাকে সাহস দিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল।

ঋতু গিয়ে দাঁড়াল আসামীর কাঠগড়ায়।

রেলিং চেপে ধরল। ভয় হচ্ছিল পড়ে যাবে।

সরকারী পক্ষের আইনজীবী রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন। বহু যুদ্ধের জয়ী সেনাপতি ভর্মাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি আজ তাঁকে হতে হবে না। বিচারপতির ইঙ্গিত পাবার পরই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন।

—ইওর অনার, আমি আজ এমন একটি কেশ নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি যার তুলনা সচরাচর মেলে না। ঋতু মাথুর কলকাতার ধনাঢ্য এবং অভিজাত পরিবারের বিধবা বধূ। উনি ভালবেসে ফেলেছিলেন নিজের দেওর বিনোদ মাথুরের সম্বন্ধী লোকেশ ট্যাণ্ডনকে। দুজনের বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় লোকেশ ট্যাণ্ডনকে হত্যা করে আজ উনি আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই ঋতু মাথুরকে ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। এবার আমি ঘটনা প্রসঙ্গে যেতে চাই। ৮ই জানুয়ারী অভিযুক্তা নিজের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি এবং প্রেমিক লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে পাটনা থেকে কলকাতা যাবার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেদিন জলহাওয়া অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ার দরুন যাত্রা করা সম্ভব হয়নি। কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এখানেই অভিযুক্তার সঙ্গে তাঁর কুমারী জীবনের প্রেমিক কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে নাটকীয় ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ইওর অনার, সময় সময় দেখা যায় মানুষ বিচিত্র মনোবিকারের শিকার হয়ে যায়। এখানেও এই ধরনের উদাহরণ উপস্থিত। বর্তমান প্রেমিককে উপেক্ষা করে অভিযুক্তা পুরনো প্রেমের বন্যায় ভেসে গেলেন।। লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আঠার মত সেঁটে রইলেন কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে। অনেক বুঝিয়েও

ওঁর বড় ভাই এবং দেওররা ওঁকে এই নক্কারজনক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হননি। বরং লোকেশ ট্যাণ্ডন তখন অভিযুক্তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

পাবলিক প্রসিকিউটার ভর্মা এক সেকেণ্ড থেমে আবার আরম্ভ করলেন, এই অবস্থার মধ্যে পড়ে লোকেশ ট্যাণ্ডনও ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা তিনি রাত সাড়ে দশটার পর অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের ঘরে গেলেন বোঝাপড়া করতে। আর তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখা যায়নি। ট্যাণ্ডনের মৃতদেহ পরের দিন ভোরে অভিযুক্তার বাথরুম থেকে আবিষ্কৃত হয়। অভিযুক্তা রাতভোর কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন একথা আমরা মেনে নিচ্ছি। এতে কিন্তু উনি দোষমুক্ত হচ্ছেন না। প্রকৃত ঘটনা হল কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে উনি নিজের ঘরে যান, মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে কথা বলেন। মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশ্রিত পানীয় ওকে খেতে দেন। এই পানীয় গ্রহণ করতে লোকেশ দ্বিধা করেনি এটাই স্বাভাবিক। তার মৃত্যু হবার পর অভিযুক্তা আবার কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ফিরে আসেন। ইওর অনাব, এক্ষেত্রে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই মামলা ধারা ৩০২-এর আওতায় পড়ে। কাজেই অভিযুক্তার বিরুদ্ধে ২২৮ ধারা অনুসারে চার্জ গঠন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

ভর্মা বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামী পক্ষের আইনজ্ঞ নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন শান্ত গলায়, ইওব অনার, এই মামলায় এমন কোন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী নেই যার ওপর নির্ভব করে ধারা ৩০২-এর আরোপ তুলে চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়। আদালতের কাছে আমাব সবিনয় অনুরোধ ভারতীয় দণ্ডবিধি ২২৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্তাকে এই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

বিচারপতি বললেন, প্রথমে দেখতে হবে, সরকার পক্ষ অভিযুক্তার বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য কোন বা একাধিক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারছেন কিনা। যদি পারেন তবে তাদের কথা আমায় শুনতে হবে। তারপর বিবেচনার বিষয় হবে, এই মামলায় ২২৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্তার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হবে না, ধারা ২২৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

ভর্মা দাঁড়িয়ে বললেন, ইওর অনার, আদালতে মুক্তি যথার্থ। এবার আমি নিজের সাক্ষীর তালিকা প্রস্তুত করতে চাই। আদালতের সুবিধার জন্য আমি সংখ্যা দিয়ে সাক্ষীদের চিহ্নিত করতে চাই।

এক॥ হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরবশ—যে গভীর রাতে কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে অভিযুক্তাকে বেরিয়ে নিজের ঘরে যেতে দেখেছিল। এবং মৃতদেহ আবিষ্কারের সময় সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

দুই ॥ রাকেশ দীক্ষিত, অভিযুক্তার বড় ভাই। যিনি অভিযুক্তাকে কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে মেলামেশায় আপত্তি করেছিলেন।

তিন ॥ বিনোদ মাথুর। যিনি অভিযুক্তার দেওর। যাঁর কাছ থেকে এই মামলায় কাজে লাগে এমন অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে।

চার ॥ প্রমোদ মাথুর। ইনিও অভিযুক্তার দেওর। নিঃসন্দেহে একজন মূল্যবান সাক্ষী।

পাঁচ ॥ ব্রজমোহন বর্মন। অভিযুক্তার কর্মচারী। অনেক তথ্য এর কাছে পাওয়া যাবে।

ছয় ॥ হোটেলের ম্যানেজার।

সাত ॥ ইন্সপেক্টার পরিহার। যিনি এই 'কেস' নিয়ে তদন্ত করেছেন।

আট ॥ ডাঃ প্রকাশ শ্রীবাস্তব। যিনি লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃতদেহ পোস্টমর্টম করেছেন।

এবং একজিবিট হিসাবে উপস্থিত করা হচ্ছে একটি লেডিস রুমাল। যা মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের মুঠোর মধ্যে ছিল। ইওর অনার, এই রুমাল অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের। আমার সাক্ষী এবং প্রমাণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে, এই মামলা ২২৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্তাকে মুক্ত করার নয়—বরং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ঋতু মাথুরকে অভিযুক্ত করে মামলাকে আগে বাড়াবার সুযোগ দেওয়া হবে এই অনুরোধ আমি আদালতের সামনে রাখছি।

ভর্মা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বসে পড়লেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছিল। দীর্ঘদেহী আহুজা শালীন ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, সরকারীপক্ষের আমার মাননীয় বন্ধু আদালতের সামনে যে দলিল প্রস্তুত করলেন, তার তাৎপর্যের কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। গুটিকয়েক সাক্ষীর নাম আওড়ে যাওয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে ঐ সমস্ত সাক্ষীর বয়ান এই মামলার শেষ কথা কিনা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেরকম আস্থাসূচক কোন ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায়নি।

সরকারীপক্ষ বলছেন, মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের হাতে অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের রুমাল পাওয়া গেছে। ইওর অনার, আমি আদালতের সামনে প্রশ্ন রাখছি, কি ভাবে প্রমাণ হবে ঐ রুমাল অভিযুক্তার? উনি কি স্বীকার করেছেন ঐ রুমাল আর কারুর নয়, তাঁরই? নিজের স্টেটমেণ্টে অভিযুক্তা এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এমন কি পুলিসের পক্ষ থেকে রুমাল সংক্রান্ত কোন প্রশ্নই করা হয়নি। আদালতে

'পুলিস ডায়রী' উপস্থিত করা হয়েছে। এটাই নিয়ম। ডায়রীর সার্টিফায়েড কপি আমার কাছে রয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি কোন সাক্ষীকেই রুমাল সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয়নি। সুতরাং এই অনুমাননির্ভর একজিবিট আদালতের সামনে উপস্থিত করার অর্থ কি? সরকারী পক্ষের বোঝা উচিত অনুমান এবং প্রমাণ একই কথার এপিঠ-ওপিঠ নয়।

আহুজা থামলেন।

চশমা ঠিক করে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, এই সম্বন্ধে আরো কিছু বলার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ রাখতে চাই। বিজ্ঞ সরকারী উকীল সাক্ষীর যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন, সবিস্ময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে দুজন বিশেষ সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। একজন রেস্টুরেন্টের বেয়ারা, যে মিসেস মাথুর এবং লোকেশ ট্যাণ্ডনের কথাবার্তা শুনেছিল। দ্বিতীয় জন হলেন কুশল ব্যানার্জী। যার ঘরে সে রাত্রে মিসেস মাথুর ছিলেন বলে জানা গেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সরকারী পক্ষ এক বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতকে অন্ধকারে রাখবার চেষ্টা করছেন। ইওর অনার, আমি মেনে নিচ্ছি, মিসেস মাথুর, সে রাত্রে ২১০ নম্বর ঘর থেকে এক সময় বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। এবং লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন—এতে কিন্তু প্রমাণ করা যায় না অভিযুক্তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। ভারতের বহু হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে সময় সময় পরিস্থিতিগত প্রমাণ সম্পর্কে যে মত দেওয়া হয়েছে, তাতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, অভিযুক্তাকে শেষবার মৃতকের সঙ্গে দেখা গেছে, শুধুমাত্র এই কারণেই তাকে হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। উদাহরণ-স্বরূপ সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাননীয় চন্দ্রচূড় কর্ণাটক প্রদেশ বনাম এম. এল. মুনিস্বামী এবং অন্যান্যদের মামলায় বলেছিলেন, অভিযুক্তার বিরুদ্ধে যে প্রমাণ প্রস্তুত করা হয়েছে তা মেনে নেবার পরও যদি দেখা যায় শাস্তি দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, তবে অভিযুক্তাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। এ. আই. আর. ১৯৭৭ সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ১৪৮৯ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। আমি পূর্বেও বলেছি, আবার বলছি, অভিযুক্তা সেদিন গভীর রাতে কিছুক্ষণ লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে ছিলেন—সাক্ষীদের এই উক্তিতে কিন্তু কোন-মতেই প্রমাণিত হয় না, অভিযুক্তাই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্বাংশে দায়ী।

ইওর অনার, এই মামলার অন্তিম পরিণতি যদি এই হয়, তবে কি প্রয়োজন আদালতের মূল্যবান সময় অকারণে নষ্ট করার? কি প্রয়োজন সরকারী ব্যায়কে বাড়িয়ে তোলার? এই সঙ্গে অভিযুক্তার মানবিক দিক এবং খরচের বহর সম্পর্কেও

বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং আমার সবিনয় নিবেদন, অভিযুক্তা ঋতু মাথুরকে এই মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।

নরেন্দ্র আহুজা নিজের ব্যক্তব্য শেষ করে বসে পড়লেন।

বিচারপতি সরকারী উকীলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আর কিছু বলার আছে? বিশেষে সুপ্রিম কোর্টের রুলিং সম্পর্কে মিঃ আহুজা যা বললেন তা নিয়ে আপনার কোন ব্যক্তব্য আছে?

রনধীর ভর্মা দাঁড়ালেন।

মুখে হাসি টেনে বললেন তিনি, ইওর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু সুপ্রিম কোর্টের যে রুলিং আদালতের সামনে উপস্থিত করেছেন, আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তা পুরাতত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন। কারণ এরপরও আরো গুরুত্বপূর্ণ রুলিং রয়েছে। ঐ ১৯১৭ সালের সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ২০১৮ পাতায় উল্লেখ রয়েছে, মাননীয় বিচারপতি উটওয়ালীয়া বলেছেন, যথেষ্ট সন্দেহের পরও কাউকে সাজা দেওয়া যায় না, তবে অপরাধ সম্পর্কে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে অভিযুক্তের উপর আরোপ গঠন করা সাক্ষীদের উপস্থিত করে মামলাকে আগে বাড়াবার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে অভিযুক্তাকে এখনই মুক্তি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং চার্জ গঠন করে মামলাকে আগে বাড়ানোই হবে সর্বাংশে যুক্তিযুক্ত।

নিজের ব্যক্তব্য শেষ করে রণধীর ভর্মা আসন গ্রহন করলেন। নরেন্দ্র আহুজা আর কোন ব্যক্তব্য রাখলেন না। চিন্তিত মুখে বসে রইলেন নিজের চেয়ারে। বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দুজনের দিকে তাকিয়ে নেবার পর বুঝলেন, এবার তাঁর বলার পালা। স্বাভাবিক কারণেই এখন তাঁর বক্তব্য ভারী সংক্ষিপ্ত।

তিনি বললেন, আদালত শেষ হবার আগেই আমি নিজের বক্তব্য আপনাদের জানিয়ে দেব।

অর্থাৎ শেষ বেলায় উনি জানাবেন, এই মামলা দায়রা সপর্দ হবে কিম্বা অভিযুক্তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। কুশল ঋতুকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ঋতুর মুখ এখন চিন্তাভাবনায় লাল হয়ে রয়েছে। নিজের সহকারীকে নিয়ে নরেন্দ্র আহুজা এগিয়ে এলেন এই সময়। বহুদর্শী ব্যবহারজীবী। অভিযুক্তার মনোভাব এই পরিস্থিতিতে কোন পর্যায় গিয়ে দাঁড়ায় তিনি ভাল রকমই বোঝেন।

নরম গলায় বললেন, চিন্তিত হবেন না। মামলা যদি শেষ পর্যন্ত সেসান্সে পৌছয়, তাতেও কিছু আসবে যাবে না। হ্যারাসমেণ্ট একটু হবে, তবে ম্যাডামকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে সফল হব বিশ্বাস করি। ঠিক আছে। আবার এখানেই

বিকেলে দেখা হবে।

উনি চলে গেলেন।

ঋতু বলল, উকীলরা এরকম বলেই থাকে। আমার ভারী ভয় করছে।

—এত নার্ভাস হলে কি চলে—কুশল বলল, মনকে এখন সামাল দিতে হবে। মিঃ আহুজা আইন জগতের একজন দিগ্‌গজ ব্যক্তি। আজেবাজে কথা বলে মক্কেলের মন ভেজাবেন না।

—আমি তা কি জানি না। তবু মনকে বোঝাতে পারছি না।

—মনকে বোঝাও মাইডিয়ার। তুমি ভেঙে পড়লে আমার খুব ভাল লাগবে ভেবেছো? ও সমস্ত কথা এখন থাক। চল, খাওয়াদাওয়ার পাট এই বেলা চুকিয়ে ফেলা যাক।

আদালত চত্বরের একধারে বহু গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ওদের ফিয়েটও ছিল ঐ যান্ত্রিক জঙ্গলের মধ্যে। দুজনে সেদিকেই এগুলো। ঋতুর বাড়িতে নয়, ওরা উঠেছে 'মৌয অ্যাণ্ড ক্লার্ক,' হোটেলে। ওখানকার রেঁস্তরাঁতে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার ফিরে আসবে এখানে। কিন্তু গাড়ির কাছবরাবর পৌঁছবার আগেই ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল রাকেশ।

ঋতুর ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

রাকেশ দ্রুত গলায় বলল, গতকাল পাটনায় এসেছি। শুনানির সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

—থাকাই তো উচিত। তোমরা সকলেই সরকারী পক্ষের সাক্ষী। আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার বড় রকম সুযোগ তোমাদের হাতে এসে গেছে।

—ও ভাবে বলছো কেন? তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি লাভ হবে? আমাদের সাক্ষী হতে বাধ্য করা হয়েছে।

ঋতু এগুবার উপক্রম করে বলল, আর কিছু বলবার নেই বোধহয়? বেলা পড়ে আসছে। আমরা লাঞ্চে যাচ্ছি।

—একটা খবর দিতে এসেছিলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে মা-বাবা আসছেন। তোমার সঙ্গে ওঁরা দেখা করতে চান।

—আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। ভবিষ্যতে তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলতে না এলে খুশী হব।

—কিন্তু কেন?

—জীবনের সেরা অবলম্বন এতদিন পরে আমি পেয়েছি। তোমরা হলে দুষ্টগ্রহ। তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই আমার মঙ্গল। বেশ, এস। আর

সময় নষ্ট করলে খিদে মরে যাবে।

হতভম্ব রাকেশের সামনে দিয়ে ওরা গাড়িতে গিয়ে বসল।

স্টার্ট নেবার পর কুশল বলল, তুমি ও ভাবে না বললেও পারতে।

—না বলে থাকতে পারি পারি না। ওরা শুধু আমারই ক্ষতি করেনি তোমার জীবনও নষ্ট করে ফেলেছিল।

—শেষ রক্ষা তো আমরা করলাম।

—আমাদের কৃতিত্ব এখানেই।

কথা শেষ করে ঋতু হাসল।

ফিয়েট তখন রাস্তায় নেমেছে।

বেলা তখন চারটে।

অ্যাডিশানাল ডিস্ট্রিক্ট জজ এর এজলাস থেকে আহ্বান পেয়ে ঋতু গিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো। আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবী নরেন্দ্র আহুজা আগেই উপস্থিত হয়েছেন। রণধীর ভর্মা রয়েছেন যথানিয়মে। বিচারপতি বিন্দু মাত্র সময় নষ্ট না করে নিজের আদেশ পালন করার জন্য তৎপর হলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, অভিযুক্ত পক্ষের প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী মিঃ আহুজা নিজের দলিল উপস্থিত করার সময় বলেছেন, পরিস্থিতিগত প্রমাণে যতক্ষণ না এটা প্রমাণিত হচ্ছে, যে আসামীর বাঁচার আর কোন উপায় নেই ততক্ষণ তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। উনি যে অন্যায় কিছু বলেছেন তা নয়। তবে এক্ষেত্রে আমি তাঁর দলিল মেনে নিতে সম্মত হচ্ছি না। কারণ এখন, এ বিচারের প্রয়োজন নেই যে অভিযুক্তা দোষী কিংবা নির্দোষ। বরং যে সাক্ষী ও প্রমাণের কথা বলা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে দেখা দরকার এই মামলার পরিণতি কি হতে পারে। সুতরাং অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের উপর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং বি ১২০ ধারায় আরোপ গঠন করার আদেশ দিলাম। এই সঙ্গে সাক্ষী তালিকায় কুশল ব্যানার্জী এবং রেস্টুরেণ্টের বেয়ারার নাম যুক্ত করা হল।

বিচারপতি থামতেই ঋতুর মনে হল, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কাঠ-গড়ার রেলিং দু হাত দিয়ে চেপে ধরে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগল। শরীরে যেন ঘামের বন্যা নেমেছে। কুশল অবশ্য নিজেকে মোটামুটি প্রস্তুত করে রেখেছিল, তবু সমস্ত শরীর ঝনঝনিয়ে উঠল।

বিচারপতি এবার নিয়মবিধি অনুসরণ করে বললেন, আমি, বিচারপতি আর. কে. দাস শ্রীমতী ঋতু মাথুরের উপর এই আরোপ গঠন করছি যে, তিনি

১৯৯০ সালে ১১ই এবং জানুয়ারী রাত্রে পাটনা শহরের এয়ার লাইন্স হোটেলে। লোকেশ ট্যাণ্ডনকে হত্যা করেছেন। কাজেই ধারা ৩০২ এবং ১২০ অনুসারে মামলা পরিচালিত হবে। এ সম্পর্কে অভিযুক্তার কি কিছু বলার আছে?

ঋতু মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিচারপতি আবার বললেন, আপনি কি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছেন?

ঋতু এবার মুখ তুলল।

বলল ভেজা গলায়, আমি কোন অপরাধ করিনি। পুলিসের পক্ষ থেকে জোর করে এই মামলায় আমাকে জড়ানো হয়েছে।

এই মামলায় আজকের বিধিব্যবস্থা এখানেই শেষ হল। এই মাসের ২৭ তারিখ থেকে মূল কার্যকরণ আরম্ভ হবে। এবং এও স্থির করে দেওয়া হল, বিচারের কার্যক্রমদিন প্রতিদিন চলতে থাকবে রায় না হওয়া পর্যন্ত। মনমরা ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে কুশল আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দাতে দাঁড়িয়েই নরেন্দ্র আহুজার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা হল, তারপর ওরা রওয়ানা হল ফিয়েটের উদ্দেশ্যে।

আজ বিচার আরম্ভ হবার দিন।

লাঞ্চের পর আদালত থেকে ডাক পাওয়া গেল। আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল ঋতু। আজ তাকে কিছুটা স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছে। সাক্ষীমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার। বিব্রতভাব নিয়ে তিনি ঘামছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে গীতা ছুঁয়ে ম্যানেজারকে প্রতিজ্ঞা করানো হল।

রণধীর ভর্মা : আপনার নাম?

ম্যানেজার : প্রেমপ্রকাশ মিনহাস।

ভর্মা : হোটেলে কতদিন ধরে কাজ করছেন?

ম্যানেজার : ন বছর কয়েক মাস।

ভর্মা : ১৯১০ সালের ১২ই জানুয়ারী সকালে আপনি কোন হত্যাকাণ্ডের সূচনা পান?

ম্যানেজার : হ্যাঁ। সকাল সাড়ে ছটা আন্দাজ সময় সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরেশ আমাকে গিয়ে জানায় ২১৬ নম্বর ঘরের বাথরুমে একজন মরে পড়ে

আছে। ঐ ঘর ঋতু মাথুরের নামে বুক ছিল। গিয়ে দেখলাম ২২৮ নম্বর ঘরের লোকেশ ট্যাণ্ডন মরে পড়ে রয়েছেন। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। স্থানীয় থানায় সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালাম।

ভর্মা: ঋতু মাথুরের সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল?

ম্যানেজার: সামান্যই। উনি আমায় জানিয়েছিলেন, খুন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। রাত্রে উনি নিজের ঘরে ছিলেন না।

ভর্মা: ঋতু মাথুর সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

ম্যানেজার: শুনেছিলাম, উনি কলকাতার এক ধনী পরিবারের বধূ। ব্যবসার কাজে পাটনায় এসেছিলেন।

ভর্মা: লোকেশ ট্যাণ্ডন ও ঋতু মাথুরের মধ্যেকার সম্পর্ক সন্দেহজনক ছিল কিনা বলতে পারেন?

ম্যানেজার: থাকলেও থাকতে পারে। বড় ঘরের বড ব্যাপার।

ভর্মা: সম্পর্ক ছিল কিনা বলুন?

ম্যানেজার: মনে হয় ছিল।

ভর্মা: কি ভাবে বুঝলেন?

ম্যানেজার: লোকেশ ট্যাণ্ডন আমার কাছ থেকে ওঁর ঘরের নম্বর চেয়েছিলেন। ওঁর গতিবিধি সম্পর্কেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

ভর্মা: মিসেস মাথুর আপনাকে বলেছিলেন, সে রাত্রে উনি ঘরে ছিলেন না—কথাটা বিশ্বাস যোগ্য?

ম্যানেজার: সকালে উনি ২১০ নম্বর থেকে বেরিয়েছিলেন, ঐ ফ্লোরের বেয়ারা দেখেছে।

ভর্মা: এমন কি হতে পারে না ম্যানেজার সাহাব, উনি গভীর রাতে ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন, কিছুক্ষণ পরে আবার ২১০ নম্বর ঘরে ফিরে গেছেন?

ম্যানেজার: হতে পারে।

ভর্মা: লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল?

ম্যানেজার: নিজের ঘরে যখন গিয়েছিলেন, দেখা হবার কথা।

ভর্মা: এরপর সকালে আমরা লোকেশকে মৃত অবস্থায় পাচ্ছি। এতে প্রমাণ হচ্ছে নাকি, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ঋতু মাথুরই দায়ী। আপনার মত কি?

ম্যানেজার: আমি কি বলবো স্যার। পুলিসের বিবেচনাকে সঠিক বলেই মনে করতে হবে।

ভর্মা : লোকেশ কেন খুন হল বলতে পারেন ?

ম্যানেজার : প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে অনেক সময় এরকম দুর্ঘটনা ঘটে।

ভর্মা : আপনি স্বীকার করছেন, দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল ?

ম্যানেজার : ঋতু মাথুর সম্পর্কে লোকেশ ট্যাণ্ডনের ব্যস্ততা ও আগ্রহ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।

রণধীর ভর্মা এবার বিচারপতির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আমার প্রশ্ন শেষ হয়েছে। আসামীপক্ষ সুযোগ নিতে চাইলে নিতে পারেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

এগিয়ে গেলেন সাক্ষীমঞ্চের দিকে।

আহুজা : লোকেশ ট্যাণ্ডন নিজেই নিজের ঘর বুক করেছিলেন ?

ম্যানেজার : বিনোদ মাথুর, লোকেশ ট্যাণ্ডন এবং প্রমোদ মাথুরকে সঙ্গে নিয়ে কাউণ্টারে এসেছিলেন। ওঁর কথাতেই আমি তিনজনকে তিনটে ঘরের ব্যবস্থা করেছি।

আহুজা : ঋতু মাথুরের ঘর কি ভাবে বুক হয়েছিল ?

ম্যানেজার : ওঁর এক কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মন মিসেস মাথুরের জন্য ঘর বুক করেছিলেন। পরে আমরা ঘরে রেজিস্ট্রার পাঠিয়েছি, উনি সই করে দিয়েছিলেন।

আহুজা : আপনি বলেছেন, মিসেস মাথুর সম্পর্কে লোকেশ আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। মিসেস মাথুরও কি লোকেশ সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন আপনার কাছে ?

ম্যানেজার : না।

আহুজা : ওঁর হাবভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কি, লোকেশ ট্যাণ্ডনের প্রতি ওঁর দুর্বলতা আছে ?

ম্যানেজার : না, মানে—হাবভাব বুঝবো কি ভাবে ? দুর্ঘটনার আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আহুজা : তবে আপনি বললেন কি ভাবে, প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে এরকম ঘটেই থাকে ?

ম্যানেজার : লোকেশ ট্যাণ্ডনের হাবভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চয় আছে।

আহুজা : একজনের হাবভাব দেখেই, ঋতু মাথুরের মত একজন অভিজাত মহিলা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুললেন ?

ম্যানেজার : আমার মনে হয়েছিল—মানে—

আহুজা : মনে হওয়ার কথা বাদ দিন। পরিষ্কার করে বলুন, লোকেশ ট্যাণ্ডনের প্রতি ঋতু মাথুরের দুর্বলতা ছিল কি ছিল না ?

ম্যানেজার : আমি জানি না।

আহুজা : কি জানেন না ?

ম্যানেজার : মিসেস মাথুরের কোন দুর্বলতা ছিল কিনা আমি জানি না।

আহুজা : আপনাদের হোটেলে প্রতি ফ্লোরে কজন করে বেয়ারা ডিউটি দেয় ?

ম্যানেজার : প্রতি ফ্লোরে ছজন করে আছে।

আহুজা : সেকেণ্ড ফ্লোরের কথাই ধরা যাক। ছজন বেয়ারা নিশ্চয় চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করে না ?

ম্যানেজার : ডিউটি ভাগ করা আছে। প্রাত সিফটে তিনজন করে কাজ করে।

আহুজা : সিফটের ডিউরেশন কি ?

ম্যানেজার : সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো। আবার বেলা দুটো থেকে রাত দশটা।

আহুদা : রাত দশটা থেকে ভোর পযন্ত কেউ থাকে না ?

ম্যানেজার : রাত্রে তো তেমন কোন কাজ থাকে না। তবু একজনকে রাখতে হয়। বলা তো যায় না কিছু। যে থাকে তাকে ওভারটাইম দেওয়া হয়।

আহুজা : এই বছরের ১১ই জানুয়ারী একজন নিশ্চয় ডিউটিতে ছিল। তার কি নাম বলতে পারেন ?

ম্যানেজার : প্রেমকুমার মিনহাসের পায়ের কাছে খানপাঁচেক বাঁধানো রেজিস্টার ছিল। ঝুঁকে তার মধ্যে থেকে একখানা বেছে নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন। তারপর সেই রেজিস্ট্রার নামিয়ে রাখলেন।

ম্যানেজার : কেউ ডিউটিতে ছিল না ?

আহুজা : আপনি একটু আগেই বলেছেন, প্রতি রাত্রেই একজন ডিউটি দেয়। যার জন্য আপনাদের ওভারটাইম দিতে হয়।

ম্যানেজার : সেদিনের ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম।

আহুজা : কি রকম ছিল ব্যাপারটা ?

ম্যানেজার : সেদিনকার জলহাওয়া ছিল অত্যন্ত খারাপ। সন্ধ্যার পর কোন ফ্লাইট পর্যন্ত রওয়ানা হতে পারেনি। অনেক কর্মচারী ডিউটিতে আসতে পারেনি। এই কারণেই সেকেণ্ড ফ্লোর আর ফোর্থ ফ্লোরে কাউকে ডিউটিতে পাঠানো সম্ভব হয়নি।

আহুজা : এর মানে দাঁড়াল, সারা রাত ব্ল্যাঙ্ক থাকার পর, পরের দিন ভোর

ছটায় ডিউটি করতে এসেছিল একজন।

ম্যানেজার : আপনি ঠিক বলছেন ?

আহুজা : ঐ বেয়ারার নাম কি ?

ম্যানেজার : রামনরেশ সোনী।

আহুজা : রামনরেশই আপনাকে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা বলেছিল ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ।

আহুজা : পরের দিন সকালে পুলিস অভিযুক্তার ঘর শিল করার আগে ঐ ঘরের চাবি আপনি পেয়েছিলেন ?

ম্যানেজার : হ্যাঁ।

আহুজা : কোথায় ছিল চাবি।

ম্যানেজার : ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ছিল।

নরেন্দ্র আহুজা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ফিরে গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। ম্যানেজারও নেমে এলেন সাক্ষীমঞ্চ থেকে। সরকারী উকীল রণধীর ভর্মা নিজের মুহুরীকে চাপা গলায় কিছু বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : আজ আর একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করতে চাই ইওর অনার।

বিচারপতি : ভাল কথা উপস্থিত করুন তাঁকে।

মুহুরীর ইশারায় বিনোদ মাথুর সাক্ষীমঞ্চে গিয়ে দঁড়োলেন। তাঁর চেহারায় অস্বাচ্ছন্দের কোন লক্ষণ নেই। মনে হয় অতীতে নানা মামলায় সাক্ষী দেবার অভিজ্ঞাতা তাঁর আছে। গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল।

রণধীর ভর্মা এগিয়ে এলেন।

ভর্মা : আসামীর কাঠগডায় যে মহিলা দাঁডিয়ে আছেন, তাঁকে আপনি চেনেন ?

বিনোদ : হ্যাঁ। উনি আমার বৌদি।

ভর্মা : উনি আসামীর কাঠগডায় কেন ?

বিনোদ : আমার সম্বন্ধী লোকেশ ট্যাণ্ডনকে হত্যা করার অপরাধে পুলিস ওকে অভিযুক্ত করেছে।

ভর্মা : হত্যা করার কারণ কি ?

বিনোদ : উনি এরকম জঘন্য কাজ করেছেন বিশ্বাস করা শক্ত। তবে পরিস্থিতি যা দাঁডিয়েছে তাতে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না।

ভর্মা : ধরুন উনি খুন করেছেন। আমি জানতে চাইছি এই খুনের পিছনে মোটিভ কি ?

বিনোদ : বলতে পারবো না। তবে—

ভর্মা : বলুন ?

বিনোদ : দাদা মারা যাবার পর উনি ভারী অসুখী ছিলেন। আমরা চাই-ছিলাম লোকেশের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাক। কিন্তু কুশল ব্যানার্জী এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল। পথের কাঁটা সরাবার জন্য যদি ব্যাপারটা ঘটে থাকে—অবশ্য আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না।

ভর্মা : এই কুশল ব্যানার্জীর ব্যাপারটা কি ?

বিনোদ : বৌদির কুমারী জীবনের বন্ধু। এলাহাবাদে একই পাড়ায় দুজনে থাকতেন। কিছু দিন হল বৌদি ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন।

ভর্মা : মোটিভ তাহলে পরিষ্কার ?

বিনোদ : আমি স্যার বলেছি, জোর দিয়ে কিছু বলবো না।

ভর্মা : লোকেশের সঙ্গে অভিযুক্তার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

বিনোদ : খুবই ভাল ছিল। তাইতো আমরা দুজনের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছিলাম।

ভর্মা : শেষ রক্ষা হল না। ওয়েল মিঃ বিনোদ, লোকেশ অভিযুক্তার ঘরে সেদিন কেন গিয়েছিল বলতে পারেন ?

বিনোদ : ঠিক বলতে পারবো না। তবে বৌদির ব্যাপারস্যাপার দেখে সে ভারী মর্মাহত হয়েছিল। মনে হয়, সোজাসুজি কথা বলতেই সেদিন ওঁর ঘরে গিয়েছিল।

ভর্মা : তখন রাত কটা ?

বিনোদ : সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল।

ভর্মা : আপনার বৌদি বলছেন উনি ঘরে ছিলেন না। তাই যদি হবে, তবে লোকেশ ওঁর ঘরে ঢুকলো কি ভাবে ?

বিনোদ : বৌদি পুলিসকে বলেছিলেন, দরজায় তালা না লাগিয়েই উনি কুশল ব্যানার্জীর ঘরে গিয়েছিলেন।

ভর্মা : ঘরে দামী জিনিসপত্র রয়েছে, তা সত্ত্বেও বোর্ডার দরজায় চাবি দেবে না কথাটা বিশ্বাসযোগ্য ?

বিনোদ : আমার মনেও খটকা লেগেছিল। এখন মনে হচ্ছে কথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভর্মা : তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ? ঋতু মাথুর সে সময় ঘরেই ছিলেন। আপনার মত কি ?

বিনোদ : এখন মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই বলছেন।

ভর্মা : লোকেশ গিয়ে দরজা নক্ করে। অভিযুক্তা দরজা খুলে দিয়ে তাকে ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেন—ব্যাপারটা এইভাবে দাঁড়িয়েছিল, কি বলেন?

বিনোদ : আপনি ঠিকই বলছেন।

ভর্মা : পোস্টমর্টমের রিপোর্ট অনুসারে মারকিউরিক ক্লোরাইড লোকেশের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

বিনোদ : আমিও সে কথা শুনেছি।

ভর্মা : আপনার ধারনায় কি ভাবে মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল?

বিনোদ : লোকেশ নিশ্চয় জল খেতে চেয়েছিল। ঐ জলেই মেশানো ছিল বিষ।

ভর্মা : অভিযুক্তার কাণ্ডকারখানায আপনাদের পরিবারের দুর্নাম রটেছে নিশ্চয?

বিনোদ : হ্যাঁ। আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। শেষ কাজটাও উনি খুবই খারাপ করেছেন।

ভর্মা : শেষ কাজ বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

বিনোদ : কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করা।

ভর্মা : উদ্দেশ্য তাহলে তো পরিষ্কার।

বিনোদ : সকলে তাই বলছে।

ভর্মা : সকলের কথা ছেড়ে দিন। আপনার মত বলুন।

বিনোদ : আপনাকে তো আগে বলেছি, আমি নিশ্চিত নই। তবে বৌদি নিজের চরিত্রের যে পরিচয় দিযেছেন, তাতে সবই সম্ভব।

রণধীর ভর্মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন। এখন তাঁকে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক মনে হচ্ছে। মন্থর পায়ে এগিয়ে গেলেন সাক্ষীমঞ্চের দিকে। বিনোদের মুখে আশঙ্কার চিহ্ন।

আহুজা : আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের পরিচয় হয় কবে?

বিনোদ : বছর পাঁচেক আগে।

আহুজা : লোকেশ তো নাগপুরে ব্যবসা করতেন। দুজনের দেখাসাক্ষাৎ হত কি ভাবে?

বিনোদ : ব্যবসার প্রয়োজনে লোকেশ প্রতি মাসেই কলকাতা আসতো। দেখাসাক্ষাতের কোন অসুবিধা ছিল না।

আহুজা : আপনি বলতে চাইছেন, বছর পাঁচেক ধরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল?

বিনোদ : আমি তাই বলতে চাইছি।

আহুজা : এতে আপনাদের পারিবারিক সম্মান নষ্ট হয়নি ?

বিনোদ : না, মানে—ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যেকার, তাই—

আহুজা : আপনি ধারাবাহিক ভাবে মিথ্যে কথা বলে চলেছেন। অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের কোন সম্পর্ক ছিল না। অভিযুক্তার বিশাল সম্পত্তির লোভেই আপনি নিজের সম্বন্ধটাকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

বিনোদ : কথাটা ঠিক নয়।

আহুজা : ঠিক কথাটা কি ?

বিনোদ : কুশল ব্যানার্জী হঠাৎ এসে না পড়লে বৌদির সঙ্গে লোকেশের বিয়ে হত।

আহুজা : আপনি বলছেন, পাঁচ বছর ধরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাই যদি হবে, এক সন্ধ্যায় অভিযুক্তার মত পালটে গেল কি ভাবে? উনি এত আন্তরিক ভাবে কুশল ব্যানার্জীর দিকে ঝুঁকলেন কেন ?

বিনোদ : স্ত্রীচরিত্র বোঝা এত সহজ নয়।

আহুজা : সাবেকি উক্তি আউড়ে ভাল ডিফেন্স নিয়েছেন। সরকারী পক্ষকে আপনি প্রকারান্তরে জানিয়েছেন, খুনের জন্য দায়ী ঋতু মাথুর। আমার প্রশ্ন এই পরিস্থিতিতে খুন করা কি অনিবার্য ছিল ?

বিনোদ : কি জানতে চাইছেন বুঝলাম না।

আহুজা : ঋতু মাথুর ধনবতী, ক্ষমতাশালী এবং স্বাধীনচেতা মহিলা। তিনি যা চাইতেন তাই করতে পারতেন। কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে তিনি নিজের স্বভাবের প্রমাণ রেখেছেন। লোকেশ ট্যাণ্ডন পথের কাঁটা হতে যাবেন কেন ?

বিনোদ : পথের কাঁটা কেন হবে আমি কি করে বলবো ?

আহুজা : আপনিই বলবেন। সরকারী পক্ষকে এই রকম ইসারাই আপনি দিয়েছেন।

বিনোদ : পুলিস বৌদিকে সন্দেহ করেছে। তাঁকে অভিযুক্ত করেছে কোর্টে। স্বাভাবিক কারণেই ধারণা হয়েছিল, ব্যাপারটা হয়তো ঠিক।

আহুজা : ধরুন, লোকেশ ট্যাণ্ডন মারা যাননি। আপনার বৌদি কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করলেন—কি ক্ষতি করতে পারতো লোকেশ আপনার বৌদির ?

বিনোদ : ক্ষতি আর কি করতে পারতো।

আহুজা : ঠিক। তাহলে লোকেশ ট্যাণ্ডনকে পথের কাঁটা বলা যায় না ?

বিনোদ : কথাটা ঠিক—মানে—

আহুজা : পরিষ্কার করে বলুন।

বিনোদ : আপনার কথার কি উত্তর দেব বুঝে উঠতে পারছি না।

আহুজা : ঋতু মাথুর কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন—আপনারা বাধা দিতে পেরেছিলেন ?

বিনোদ : না।

আহুজা : আপনাদের উনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। যা মন চেয়েছে তাই তাই করেছেন। লোকেশকে বাধা মনে করবেন কেন ?

বিনোদ : আমি কি করে বলবো ?

আহুজা : প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে লোকেশ অভিযুক্তার পথের কাঁটা ছিলেন না। তাই তো ?

বিনোদ : এ সম্বন্ধে আমার কোন মতামত নেই।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড বস্তুটা কি ?

বিনোদ : ঠিক জানি না। শুনেছি একধরনের বিষ।

আহুজা : এই বিষ সহজলভ্য ?

বিনোদ : বোধহয় না।

আহুজা : যে বস্তু সহজলভ্য নয়, আপনার বৌদি কি ভাবে সংগ্রহ করলেন ?

বিনোদ : বলেত পারবো না।

আহুজা : আপনি তো অধিকাংশ প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। সাক্ষী হিসাবে যখন উপস্থিত হয়েছেন তখন প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিন।

বিনোদ : যা জানি না তার উত্তর কি ভাবে দেব ?

আহুজা : বেশ। যা জানেন সেই ধরনের প্রশ্নই করছি। আপনার বৌদিকে কি বুদ্ধিমতী মহিলা বলা যায় ?

বিনোদ : ওকে কেউ নির্বোধ বলবে না।

আহুজা : কেন ?

বিনোদ : বুদ্ধি না থাকলে দাদার অনুপস্থিতিতে এত ভাল ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছেন কি ভাবে।

আহুজা : আপনি তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন, কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে উনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ?

বিনোদ : না, মানে—এই ব্যাপারটা—

আহুজা : বলতে চাইছেন এই ব্যাপারটা অন্য ধরনের। বেশ। এবার তাহলে অন্য আরেক দিক বিবেচনা করা যাক। একজন বুদ্ধিমতী মহিলা নিজের ঘরে—একজনকে খুন করবেন, এটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ?

বিনোদ : এরকম হওয়া তো উচিত ছিল না। অথচ হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি আর কি বলবো ?

আহুজা : আপনিই বলবেন। আপনি স্বীকার করেছেন, উনি একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। তবে কেন অভিযুক্তা নিজের ঘরে একজনকে খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরবার চেষ্টা করলেন ?

বিনোদ : আমি জানি না।

আহুজা : আপনি নিশ্চয় নির্বোধ নন। আপনার কমনসেন্স কি বলছে ? এরকম হওয়াটা কি উচিত ছিল ?

বিনোদ : না। খুন কিন্তু হয়েছে।

আহুজা : তা তো হয়েছেই। অন্য কেউ ঐ ঘরে লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করে আপনার বৌদিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছে, এখন কি আপনার তা মনে হচ্ছে না ?

বিনোদ : মনে হচ্ছে। তবে—

আহুজা : আপনি পরিষ্কার করে বলুন আমার যুক্তি ঠিক কিনা ?

বিনোদ : একদিক থেকে দেখতে গেল আপনার যুক্তি ঠিক।

আহুজা : অপনি তাহলে স্বীকার করে নিলেন, অভিযুক্তা লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেননি ?

বিনোদ : আমি স্বীকার করে নিলেও, একটা খুন কিন্তু হয়েছে।

আহুজা : বটেই তো। লোকেশকে অন্য কেউ খুন করে থাকলে বর্তমানে এই আদালতের কোন মাথাব্যথা নেই। বিচার্যের বিষয় হল অভিযুক্তা আরোপিত দোষ করেছেন কিনা। আপনি নিজের পরিষ্কার মত দিন, এখন কি আপনার মনে হচ্ছে, ঋতু মাথুরই লোকেশকে খুন করেছেন ?

বিনোদ : আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনার যুক্তি ঠিক হলে উনি লোকেশকে খুন করেননি।

আহুজা : ধন্যবাদ। আমার আর কোন প্রশ্ন নেই।

নরেন্দ্র আহুজা নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

ঋতু নেমে এল আসামীর কাঠগড়া থেকে।

বলা বাহুল্য এই মামলার কাজ আজকের মত শেষ হল।

রাকেশ দিক্ষিতকে আজ সাক্ষীর জন্য ডাকা হয়েছে।

বিব্রত ভাব নিয়ে এসে দাঁড়াল। গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল এক

সময়। রণধীর ভর্মা এগিয়ে এসে তার পরিচয় আদালতের সামনে রাখলেন। তারপর প্রশ্ন-উত্তর আরম্ভ হল।

ভর্মা : আপনার সহোদরার সঙ্গে কুশল ব্যানার্জীর ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

রাকেশ : অল্প বয়সের দুর্বলতা বলতে পারেন।

ভর্মা : দুজনের বিয়ে হল না কেন ?

রাকেশ : সামাজিক স্ট্যাটাসে পার্থক্য ছিল। কুশলের মত অতি সাধারণ ছেলেকে আমরা জামাই করতে রাজী হইনি।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডনের ব্যাপারটা কি ?

রাকেশ : ঋতু খুব একা হয়ে পড়েছিল। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চাই-ছিলেন, ওর সঙ্গে লোকেশের বিয়ে হয়ে যাক।

ভর্মা : আপনি কি চাইছিলেন ?

রাকেশ : আমিও তাই চাইছিলাম।

ভর্মা : আপনার সহোদরার মত কি ছিল এ সম্পর্কে ?

রাকেশ : ওর অমত ছিল না।

ভর্মা : দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি ?

রাকেশ : ঠিক বলতে পারবো না। তবে মেলামেশা ভালই ছিল।

ভর্মা : তবু দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এর যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে নিশ্চয় ?

রাকেশ : কারণ একটাই। কুশল ব্যানার্জী। তার প্ররোচনাতেই লোকেশ খুন হয়েছে।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, এই খুনের জন্য দায়ী কুশল ব্যানার্জী ?

রাকেশ : হ্যাঁ। পুলিসের অপরিণামদর্শিতার দরুণ ঋতুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসল আসামী কুশল ব্যানার্জী।

এই সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার হল।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঋতু চিৎকার করে উঠল, মিথ্যে কথা। ব্যানার্জীকে মিথ্যে কথা বলে জড়ানো হচ্ছে।

রণধীর ভর্মা ওর দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভর্মা : সত্যি কথাটা তাহলে কি ?

ঋতু : আমি জানি না।

ভর্মা : যখন জানেন না তখন কি ভাবে বলছেন, কুশল ব্যানার্জীর এই হত্যাকাণ্ডে হাত নেই।

ঋতু : আমরা দুজন সে রাত্রে একই সঙ্গে ছিলাম। একবারও ঘর থেকে

আমরা বাইরে আসিনি।

ভর্মা : কোন সাক্ষী নেই। কুশল ব্যানার্জীকে আড়াল করার অর্থ হল এই খুনের দায়িত্ব আপনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন।

ঋতু কিছু বলতে যাবার আগেই নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা : কথার মারপ্যাচে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। চাক্ষুষ সাক্ষী কোথায়?

ভর্মা : আমার মাননীয় বন্ধু ভুলে যাচ্ছেন, পরিস্থিতিগত প্রমাণ অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষার বিষয় নয়।

আহুজা : অনেক ক্ষেত্রের কথা বাদ দিন। আমি এই ক্ষেত্র সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি।

ভর্মা কিছু বলার আগেই বিচারপতি মন্তব্য করলেন।

বিচারপতি : এই বির্তক এখন থাক। সাক্ষীকে জেরা করার ধারাবাহিকতা বাদীপক্ষ বজায় রাখুন।

ভর্মা : ইওর অনার, আদেশ আমরা মেনে চলবো।

উনি ঘুরে দাঁড়ালেন রাকেশ দিক্ষিতের দিকে।

ভর্মা : আপনি তো এলাহাবাদে থাকেন। ১১ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় আপনি পাটনা এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন কি ভাবে?

রাকেশ : ব্যবসার কাজে ঐদিন সকালে পাটনায় এসেছিলাম। সন্ধ্যার মুখে খবর পেলাম ঋতু এসেছিল এবং রাতের ফ্লাইটে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে।

ভর্মা : আপনি দেখা করতে গেলেন?

রাকেশ : জল হাওয়া ভারী খারাপ ছিল। অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই না গিয়ে থাকতে পারিনি।

ভর্মা : দুজনের মধ্যে কি প্রসঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল।

রাকেশ : ওর সঙ্গে লোকেশের বিয়ে নিয়ে কথা হয়েছিল।

ভর্মা : ওর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন?

রাকেশ : বিয়ের ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

ঋতু আবার বাধার সৃষ্টি করল।

ঋতু : মিথ্যে কথা। প্রথম থেকেই এই বিয়েতে আমার আপত্তি ছিল। ওঁর মুখের উপর সেদিনও আমি আবার আপত্তি করেছিলাম।

ভর্মা : ইওর অনার, এইভাবে বারংবার বাধার সৃষ্টি হলে একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায়।

বিচারপতি : অভিযুক্তাকে সতর্ক করা হচ্ছে, এইভাবে বাধার সৃষ্টি করে

সময়ের অপচয় করবেন না।

ভর্মা : ওয়েল মিঃ রাকেশ, তারপর কি হল ?

রাকেশ : মিনিট কুড়ি ওখানে থাকার পর আমি চলে এলাম।

ভর্মা : রাত্রে আপনি হোটেলেই ছিলেন ?

রাকেশ : হ্যাঁ। খারাপ জল-হাওয়ার দরুন ট্যাক্সি পেতাম না। হোটেলেই তাই থেকে যেতে হয়েছিল।

ভর্মা : দুর্ঘটনার কথা সকালে জানতে পারার পর আপনি কি করলেন ?

রাকেশ : আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কি যে করবো ঠিক করা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। পুলিস জিজ্ঞেসবাদ করলে, যা জানতাম বললাম। তারপর ওরা ঋতুকে ধরে নিয়ে গেল।

ভর্মা : আপনার কথায় আচ পাওয়া যাচ্ছে, কুশল ব্যানার্জীর হঠাৎ উপস্থিতিই এই হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ, নয় কি ?

রাকেশ : আপনি ঠিক বলছেন।

ভর্মা : এমন তো হয়নি, আপনার সহোদরা এবং কুশল ব্যানার্জী ষড়যন্ত্র করে এই খুনের ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন ?

রাকেশ : খুনের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই। ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কুশল ব্যানার্জী সরিয়েছে।

ভর্মা : অভিযুক্তা বলেছেন, সে রাত্রে তিনি কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন। আপনার কথাই যদি ঠিক হয় তবু প্রমাণ হচ্ছে না অভিযুক্তা কিছুই জানতেন না বা এই ব্যাপারে তার হাত নেই।

রাকেশ : আমার ধারণা ঋতু কিছুতেই জানতো না—এই ব্যাপারে তার হাত নেই।

ভর্মা : 'ধারণা' শব্দটা বোগাস। আপনি পরিষ্কার করে বলুন ?

রাকেশ : আমি যা বলবার বলেছি। আর কিছু বলার নেই।

ভর্মা : ঋতু মাথুরই লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন—এটাই বাস্তব ঘটনা। ভেবেচিন্তে মত দিন।

রাকেশ : আপনার ধারণা সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। আমার যা বলবার আগেই বলেছি।

ভর্মা : পুলিস কিন্তু অভিযুক্ত করেছে ঋতু মাথুরকে।

রাকেশ : পুলিসের বিবেচনাবোধে আমি দখল দিতে পারি না। আমার আর কোন বক্তব্য নেই।

ভর্মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

উনি আসন গ্রহণ করার পরই উঠে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র আহুজা।

আহুজা : আপনি বলেছেন, কুশল ব্যানার্জী এই হত্যাকাণ্ডর জন্য দায়ী ?

রাকেশ : বলেছি।

আহুজা : পুলিস যখন আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল তখন নিজের সন্দেহের কথা ওদের বলেছিলেন ?

রাকেশ : না।

আহুজা : কেন বলেন নি ?

রাকেশ : আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক কি বললে ঋতুকে বাঁচানো যাবে বুঝে উঠতে পারিনি।

আহুজা : মিথ্যা কথা বলছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে তখন আপনি পুলিসকে কুশল ব্যানার্জী নাম বলেননি।

রাকেশ : আমি কোন মিথ্যার আশ্রয় নেইনি। ঋতুকে আমি বাঁচাতে চাই না, এই কথাই আপনি বলতে চাইছেন ?

আহুজা : ঠিক তাই। পুলিসকে আপনারা কেউ একবারও বলেননি এই হত্যাকাণ্ডর সঙ্গে অভিযুক্তার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার নিজের সহোদরা, তা সত্ত্বেও 'বেল' এর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাননি।

রাকেশ : কুশল সব ব্যবস্থা করছে। কাজেই—

আহুজা : কুশলকে তো আপনি পছন্দ করেন না। তাহলে 'বেল' নেওয়ার ব্যাপারটা তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হল কেন ?

রাকেশ : আমি কি বলবো। মানে—

আহুজা : এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটা উপেক্ষার বিষয় নয়। শুধু আপনি নন, অভিযুক্তার শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও কোন ইণ্টারেস্ট নেননি। এই অনীহার কারণ কি তা জানার অধিকার এই আদালতের আছে। উত্তর দিন কেন আপনি ইণ্টারেস্ট নেননি।

রাকেশ : আমি কি বলবো। কোন প্যাঁচালো চিন্তাধারা এর মধ্যে ছিল না। তবে এ ব্যাপারে আমার এগিয়ে না যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে।

আহুজা : এটা ইচ্ছাকৃত। কারণটা বলুন ?

রাকেশ : আপনি বলতে চাইছেন, ঋতুর ফাঁসি বা আজীবন কারাবাস হয়ে যাক আমরা তাই চেয়েছিলাম ?

আহুজা : তা যদি না চাইবেন তবে ব্যস্ততা প্রকাশ করেননি কেন ? ছুটোছুটি

করে ওঁর 'বেল'-এর ব্যবস্থা করেননি কেন? কেন এমন লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাকে আপনারা কেউই পছন্দ করেন না?

রাকেশ: ঋতুকে বিপদে ফেলে আমাদের কি লাভ?

আহুজা: লাভক্ষতির হিসাব আপনার মুখ থেকে জানতে চাইছি?

রাকেশ: কোন হিসাব নেই।

আহুজা: সে রাত্রে অভিযুক্তা কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন?

রাকেশ: জানি।

আহুজা: আপনার বিধবা বোন পরের ঘরে গিয়ে রাত কাটালেন, এ সম্পর্কে আপানার কোন বক্তব্য আছে?

রাকেশ: কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মাথা গলাই না।

আহুজা: মিথ্যে কথা বলছেন। লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে অভিযুক্তার বিয়ে হয়ে যাক এ নিয়ে আপনি চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। এটা কি পরের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলানো নয়?

রাকেশ: আমি ঋতুর ভাল করতে চেয়েছিলাম।

আহুজা: আপনি সব সব সময়ে নিজের ভাল চেয়ে এসেছেন?

রাকেশ: হ্যাঁ।

আহুজা: ভাল চাইলে, আপনি কুশল ব্যানার্জীকে হত্যাকরী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতেন না।

রাকেশ: আমার বোনের ভাল-মন্দর সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

আহুজা: গভীর সম্পর্ক আছে। একই ঘরে দুজন রয়েছে। মনে রাখতে হবে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ভারী মধুর। একজন ঘর থেকে বেরুল গুরুতর অপরাধ করতে, অন্যজন কিছু জানল না?

রাকেশ নীরব রইল।

আহুজা: চুপ করে থাকবেন না। বলুন, এটা সম্ভব কিনা?

রাকেশ: তখন হয়তো ঋতু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আহুজা: পোস্টমর্টমের রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাত সাড়ে দশটা থেকে বারটার মধ্যে লোকেশ ট্যাণ্ডন মারা গেছেন। অভিযুক্তা সাড়ে দশটার সময় কুশল ব্যানার্জীর ঘরে গিয়েছিলেন। বহু বছর পরে দুজনের একান্ত সাক্ষাৎ—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্ন ওঠে কি?

রাকেশ নীরব।

আহুজা : বলুন, আমি যা বলছি ঠিক কিনা ?

রাকেশ : আপনার যুক্তি হয়তো ঠিক।

আহুজা : যুক্তি নয়, এটাই বাস্তব। স্বাভাবিক কারণেই ওঁরা অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক জেগে ছিলেন। তাহলে কি দাঁড়াল ?

রাকেশ : আমি তো বুঝতে পারছি না।

আহুজা : এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না! পোস্টমর্টম রিপোর্টের সময়সীমার মধ্যে ওঁরা দুজনেই জেগেছিলেন। কাজেই একজন ঘর থেকে বেরুলে আর একজনের অজানা থাকার কথা নয়। এবার বলুন, কুশল ব্যানার্জী লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : এখন মনে হচ্ছে, ঘটনাটা অন্যভাবে ঘটেছে।

আহুজা : ওভাবে নয়, পরিষ্কার করে বলুন, কুশল ব্যানার্জী কি লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : না, বোধহয়।

আহুজা : ঋতু মাথুর কি লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন ?

রাকেশ : না।

আহুজা : অভিযুক্ত কুশল ব্যানর্জীকে বিয়ে করায় আপনি নিশ্চয় খুশী হতে পারেননি।

রাকেশ : খুশী না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

আহুজা : এই কারণেই আপনি কুশল ব্যানার্জীর উপর দোষ চাপাচ্ছিলেন। এও একধরনের প্রতিশোধস্পৃহা—কি বলেন।

রাকেশ নীরব রইল।

আহুজা : বলুন ? চুপ করে থাকবেন না।

রাকেশ : আমার আর কিছু বলার নেই।

নরেন্দ্র আহুজা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। উনি আসন গ্রহন করার পরই, আরো একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করার অনুমতি চাইলেন রণধীর ভর্মা। বিচারপতি সম্মতি জানালেন। এবার সাক্ষীমঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন প্রমোদ মাথুর। শপথ গ্রহণ ও পরিচয়ের পালা শেষ হল অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃত্যু সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

প্রমোদ : খুন হয়েছে।

ভর্মা : তা তো হয়েছেই। আমি আপনার ধারনার কথা জানতে চাইছি।

প্রমোদ : ধারণা তো পরিষ্কার। ওকে খুন করা হয়েছে।

ভর্মা : আমার প্রশ্ন আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। আমি জানতে চাইছি, আপনার ধারণায় লোকেশকে কে খুন করেছে ?

প্রমোদ : পুলিস সে কথা বলেছে।

ভর্মা : আদালত আপনার মুখ থেকে শুনতে চায়।

প্রমোদ : এ কাজ আমাদের বৌদির।

ভর্মা : কেন তিনি লোকেশকে খুন করলেন ?

প্রমোদ : উনি যে এত বেহায়া আর বেপরোয়া আমি আগে বুঝতে পারিনি : কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার পরই উনি নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন।

ভর্মা : খুনের উদ্দেশ্য কি ?

প্রমোদ : প্রেম আর ব্যভিচারের তাড়নায় এই কাজ উনি করেছেন।

ভর্মা : কিন্তু এরকম শোনা গেছে, লোকেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ওর প্রেমের সম্পর্ক ছিল।

প্রমোদ : আমরাও তাই জানতাম। এই কারণেই দুজনের বিয়ে হয়ে যাক সকলে চেয়েছিল।

ভর্মা : অভিযুক্তা তো সে রাত্রে কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন। খুন করলেন কি ভাবে।

প্রমোদ : একসময় উনি কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। লোকেশ ওখানেই ছিল। তারপর ওকে ছলাকলায় ভুলিয়ে উনি নিজের কাজ সেরেছেন।

ভর্মা : গভীর রাতে অভিযুক্তা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, কুশল ব্যানার্জী বুঝতে পারেনি।

প্রমোদ : বুঝতে পেরেছিল।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, কুশল ব্যানার্জীর এই ব্যাপারে সমর্থন ছিল ?

প্রমোদ : নিশ্চয় ছিল।

ভর্মা : অভিযুক্তার তালিকায় আর কারুর কিন্তু নাম নেই।

প্রমোদ : এটা পুলিসের দোষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভাল ভাবে তদন্ত না করেই কেশ সাজায়।

ভর্মা : মারকিউরিক ক্লোরাইডের সাহায্যে লোকেশকে খুন করা হয়েছিল, শুনেছেন বোধহয় ?

প্রমোদ : শুনেছি।

ভর্মা : এই ভেষজ অভিযুক্তা কি ভাবে সংগ্রহ করেছিলেন বলতে পারেন ?

প্রমোদ : টাকা খরচ করলে সবই পাওয়া যায়। উনি ধনী মহিলা। প্রচুর টাকা আছে ওঁর। ওষুধের দোকানও আছে বৌদির।

ভর্মা : ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই।

রণধীর ভর্মা আসন গ্রহন করলেন।

উঠে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র আহুজা। এগিয়ে গেলেন সাক্ষীমঞ্চের দিকে।

আহুজা : আপনি বলেছেন, অভিযুক্তা এবং কুশল ব্যানার্জী ষড়যন্ত্র করে লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন ? এ কথা বলেছেন কি ?

প্রমোদ : বলেছি।

আহুজা : আদালতে সে কথা বলতে পারলেন, পুলিসকে বলেননি কেন ?

প্রমোদ : কোন্ কথা ?

আহুজা : কুশল ব্যানার্জী এই হত্যাকাণ্ডের একজন অংশীদার—আপনার সন্দেহর কথা ?

প্রমোদ : কেন বলিনি মনে পড়ছে না।

আহুজা : সন্দেহ আর প্রমাণ এক কথা নয়, নিশ্চয় বোঝেন ? কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করছে আপনার অভিযোগ ?

প্রমোদ : প্রমাণ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার নয়।

আহুজা : প্রমাণ ছাড়াই কারুর উপর দোষ চাপানো আপনার দায়িত্ব হওয়া উচিত নয়। আপনার সন্দেহের জোড় কত শক্ত এবার তাই দেখা যাক। লোকেশ ট্যাণ্ডনের দেহের গঠন কেমন ছিল ?

প্রমোদ : দোহারা গডনের দীর্ঘকায় লোক ছিল।

আহুজা : ওরকম একজন ভারী চেহারার পুরুষকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা অভিযুক্তার পক্ষে সম্ভব ?

প্রমোদ : লোকেশের মৃত্যুর পর কুশল ব্যানর্জী হয়তো ওখানে গিয়ে পড়েছিল।

আহুজা : তারপর দুজনে মিলে মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গেছেন ?

প্রমোদ : হ্যাঁ।

আহুজা : আপনার কথা মেনে নিয়েই প্রশ্ন করছি, মৃতদেহ বাথরুমে ফেলে রাখা হল কেন ?

প্রমোদ : আমি জানি না।

আহুজা : জানেন না ! অথচ বলছেন, মৃতদেহ ওখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ? আদালতকে বলুন, আপনার ধারণায় মৃতদেহ ওখানে কেন পড়েছিল ?

প্রমোদ : আমার কোন ধরণা নেই।

আহুজা : অভিযুক্তা ঋতু মাথুরকে তো আপনি দীর্ঘদিন ধরে জানেন। ওঁকে কি নির্বোধ বলে মনে হয়?

প্রমোদ : না।

আহুজা : উনি কি বুদ্ধিমতি মহিলা?

প্রমোদ : হ্যাঁ।

আহুজা : অভিযুক্তা বুদ্ধিমতী হয়েও লোকেশের মৃতদেহ নিজের বাথরুমে ফেলে রাখলেন কেন? কুশল ব্যানার্জীর সহযোগিতায় ঘরের বাইরে, করিডরে ফেলে রাখলে কেউ ওঁকে সন্দেহ করতো না। এই সহজ বুদ্ধিটা ওঁর মাথায় আসেনি কেন।

প্রমোদ : আমি কি করে বলবো।

আহুজা : আপনাকেই বলতে হবে। আপনি ওদের অভিযুক্ত করছেন। কারুর নামে যা ইচ্ছে তাই বলাব অধিকার আইন দেয়নি কাউকে।

প্রমোদ : মৃতদেহ বাইরে সরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

আহুজা : স্বীকার করলেন। আবার একথাও বলেছেন, ঋতু মাথুর ব দ্ধমতী মহিলা। আপনার ক মনে হচ্ছে না, অভিযুক্তাকে এক ষড়যন্ত্রে জড়ানো হয়েছে?

প্রমোদ : কে ওকে ষড়যন্ত্র জড়াবে?

আহুজা : এখন বিচায ত৷ নয়। এমন কি হতে পারে ন, অভিযুক্তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে লোকেশকে খুন করেছে অন্য কেউ?

প্রমোদ : কে খুন করবে?

আহুজা : কে করেছে এখন তা বড় প্রশ্ন নয়। আম যা বললাম, সে রকম সম্ভাবনা আছে কিনা তার উত্তর দিন।

প্রমোদ : বৌদি দোষী না হলে এরকম সম্ভাবনা আছে।

আহুজ৷ : এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়েছে। লোকশ মরেছে, এই সঙ্গে ঋতু মাথুরকেও সন্দেহের ঘেরায় এনে ফেলা সম্ভব হয়েছে। আপনি কি বলেন।

প্রমোদ : আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না।

আহুজা : একটা কিছুতো বলতেই হবে। বলুন, আমি যা বলেছি, সেরকম সম্ভাবনা আছে কিনা?

প্রমোদ ইতঃস্তত ভঙ্গীতে চুপ করে রইল।

আহুজা : চুপ করে থাকবেন না। বলুন?

প্রমোদ : সম্ভাবনা আছে।

আহুজা : আপনি সরকারী পক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

প্রমোদ : আমরা সেই রকমই জানতাম।

আহুজা : মেনে নিলাম। দুর্ঘটনার পর পুলিস আপনাকে জেরা করেছিল ?

প্রমোদ : করেছিল।

আহুজা : পুলিসকে যা বলেছিলেন সব মনে আছে ?

প্রমোদ : মোটামুটি মনে আছে।

আহুজা : তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আপনার আজকের দেওয়া সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে ?

প্রমোদ : কি ভাবে ? আমি তো—

আহুজা : আপনি নিজেই নিজেকে মিথ্যাবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

প্রমোদ : পুলিসকে আমি এমন কোন কথাই বলিনি, যাতে এখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলা যায়।

আহুজা : বলেছেন। পুলিস-ডায়রীর সার্টিফায়েড কপি আমাব কাছে রয়েছে। ইন্সপেক্টার পরিহার আপনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার বৌদির সঙ্গে লোকেশের সম্পর্ক কেমন ছিল উত্তরে আপনি বলেছেন, কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমি জানি না। কখনও দুজনকে আন্তরিক ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলতেও দেখিনি। সেই-ই আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আদালতকে বিভ্রান্ত করছেন।

প্রমোদ বিব্রত ভঙ্গীতে চুপ করে রইল।

তার কপাল ও মুখে ঘামের স্রোত বয়ে চলেছে।

আহুজা : বলুন—বলুন—কোন কথাটা ঠিক ?

প্রমোদ : পুলিসকে কি বলেছিলাম, আমার মনে ছিল না।

আহুজা : এখন নিশ্চয় মনে পড়ে গেছে ? এবার আদালতকে সত্যি কথাটা বলুন। ঋতু মাথুরের সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কি ছিল না ?

প্রমোদ : ছিল কিনা আমি জানি না।

আহুজা : কেউ আপনাকে বলেছিল ওঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আছে ?

প্রমোদ : না।

আহুজা : তবে কেন এই আদালতে কিছুক্ষণ আগে আপনি মিথ্যার জাল বুনেছিলেন।

প্রমোদ : আমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি।

আহুজা : আবার মিথ্যাকথা বলছেন। প্রশ্নের গুরুত্ব ঠিকই বুঝেছিলেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ধরনের কথা বলে আপনি অভিযুক্তার বিরুদ্ধে মোটিভ তৈরী করার চেষ্টা করেছেন।

প্রমোদ : এতে আমার কোন স্বার্থ নেই।

আহুজা : স্বার্থ না থাকলে, অস্তিত্ব নেই এমন ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেবার অর্থ কি? অকারণে কেউ কাউকে খুন করে?

প্রমোদ : না।

আহুজা : অভিযুক্তা কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন। কারুব বাধা দেবার সাহস হয়েছে?

প্রমোদ : না।

আহুজা : কেন?

প্রমোদ : বৌ।দ স্বাধীন ম হলা। কারুর বাধা মানবেন কেন?

আহুজা : ঠিক বলেছেন। লোকেশের তাহলে কোন বাধা ছিল না। তাকে অগ্রাহ্য করেই অভিযুক্তা কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করতে পাবতেন?

প্রমোদ : হ্যাঁ।

আহুজা : আপনার কথায় এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, লোকেশকে খুন করার কোন মোটিভ ঋতু মাথুরের ছিল না।

প্রমোদ : আমি আর কি বলবে।

আহুজা : মিথ্যাব জাল বুঝতে গিয়ে আপনি ধরা পড়ে গিয়েছেন। এখন আদালতের সামনে পরিষ্কার করে বলুন, অভিযুক্তার লোকেশকে খুন করার কোন মোটিভ ছিল কি ।ছল না?

প্রমোদ : এখন মনে হচ্ছে ।ছল না।

আহুজা : ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই।

নরেন্দ্র আহুজা নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

আজকের মত এই মামলার কাজ শেষ হল।

নটা বাজতে তখন দশ ।মনিট বাকী আছে।

"মৌর্য অ্যাণ্ড ক্লার্ক" হোটেলের একশো কুড়ি নম্বর ঘর জোরালো আলোয় উদ্ভাসিত। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ঋতু সোফায় এসে বসল। রুম সার্ভিসকে নৈশ আহারের মেনু জানিয়ে দিল। এই সঙ্গে এও বলেছিল, খাবার যেন সাড়ে নটার পর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঋতুর চেহারার এখন অনেক পবিবর্তন হয়েছে। বিয়ের পর ওর চাপা লালিত্য

যেন ফুটে বেরিয়েছে। কুশল এখন ঘরে নেই। কোর্ট থেকে ফেরার পর আবার বেরিয়ে গেছে। যদিও ছুটিতে আছে। তবু গেছে ওদের জোনাল অফিসেই। কার সঙ্গে কি যেন কথা আছে।

ঋতু রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিল।

ওকে আজ কেমন মনমরা দেখাচ্ছে।

কুশল ফিরল সওয়া নটার সময়। টাই-নট ঢিলে করতে করতে হাসল। তার-পর এসে বসল সোফায়। দুহাত দিয়ে ঋতুকে নিজের কাছে টেনে নিল। বহু বছরের ফাঁকটা এমন ভাবে বুজে গেছে যে, এখন মনেই হয় না ওরা সদ্য বিবাহিত।

ঋতু অনুযোগের সুরে বলল, কতক্ষণ ধরে আমি একা রয়েছি বল তো?

—একটু দেরি হয়ে গেল।

—একটু নয়। বেশ দেরিতে ফিরেছো।

—রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজই এসেছে কলকাতা থেকে। এখন আমার কাজ ঐ দেখছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

—এদিকে আমি চুপ করে বসে আছি। কিছুই করার নেই।

কুশল মৃদু হেসে বলল, সন্ধ্যার কথা বাদ দাও। পুরো রাত পড়ে রয়েছে। অনেক কাজ করার সুযোগ আমরা পাবো।

ঋতু ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার।

—সত্যি কথা বলতে কি আমি ভারী ভাল ছেলে ছিলাম। কিন্তু এমন নেশা তুমি ধরিয়েছো যে সব লাগামের বাইরে চলে গেছে।

—ভূতপূর্ব ভাল ছেলেটির জন্য এখন কিন্তু আমি বেশ চিন্তিত।

—কেন মাইডিয়ার, আমি আবার কি করলাম?

—তুমি কিছু করনি। কিছু লোক তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।

সবিস্ময়ে কুশল বলল, সে কি! তারা কারা?

—বেঞ্জ, তোমাকে নিয়ে আর পারলাম না। চোখ কান বন্ধ করে থাকো নাকি?

—কি হয়েছে বল তো?

—আমি কোর্ট এর কথা বলছি।

—কোর্টের কথা বলছো? সব তো ঠিকমতই এগুচ্ছে। দেখে নিও, আমার মন যা বলছে তাই হবে। কোর্ট তোমাকে ছেড়ে দেবে।

ঋতু ওর মুখে ঠোঁট বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমি আমার কথা বলছি না। আমার

দুশ্চিন্তা তোমাকে নিয়েই। ওরা তোমাকে জড়াবার জন্য কোর্টে কি রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দেখছো তো!

—চেষ্টা চালাতে দাও। আমাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

—তুমি হাল্কা ভাবে ব্যাপারটা নিও না। চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এক, এক সময় আমার মনে হচ্ছে, তোমার জীবনে আমি না এলেই ভাল হত।

—কি আজেবাজে বলছো?

—ঠিকই বলছি। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে তুমি এই ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে না। একটা বিপদের সম্ভাবনা তোমাকে তাড়া করে ফিরতো না।

জোরে হেসে উঠল কুশল।

তারপর হালকা গলায় বলল, সুপারস্টেশনকে প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থই হল নিজেকে দুর্বল করে তোলা। আর দুশ্চিন্তা—আমাকে তুমি ভারী ভালবাস, দুশ্চিন্তা তো হবেই। শোন, হাজার চেষ্টা করলেও এই মামলায় ওরা আমাকে জড়াতে পারবে না। মিঃ আহুজার জেরায় এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করার ব্যাপারে তোমার বা আমার কোন মোটিভ ছিল না।

—তবু মনকে বোঝাতে পারছি না।

—আমি বলছি কিছুই হবে না। তুমি দেখে নিও, আমাদের বাকী জীবন ভারী আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটবে।

ঋতু দু হাত দিয়ে কুশলের গলা জড়িয়ে ধরল।

—আমি কোন মূল্যেই তোমাকে আর হারাতে চাই না। তাই তো সব সময় এত শঙ্কিত হয়ে থাকি।

কুশল কিছু বলার আগেই ডোরবেল বেজে উঠল।

এখন নটা বেজে কুড়ি। বেয়ারা এত তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এসেছে। ঋতুর, চোখে ভাজ, মুখে আঁচল বুলিয়ে নিয়ে ও উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সবিস্ময়ে দেখল বেয়ারা নয়, রাকেশ দাঁড়িয়ে আছে। মন ভারী হয়ে উঠল।

ঝাঁজ মেশানো গলায় ঋতু বলল, কেন আমাকে বারবার বিরক্ত করছো বল তো?

রাকেশ বলল, মা-বাবা কাল আসবেন তোমাকে বলেছিলাম। ওঁরা আজ কিছুক্ষণ আগে পাটনায় এসেছেন।

—তোমাকে বলেছি, আমি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাই না।

—ওঁরা কারাশিয়াং থেকে আসছেন।

ঋতুর মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা গুলিয়ে উঠল।

—কারশিয়াং থেকে কেন?

—ওঁরা লুনাকে সঙ্গে এনেছেন। বাবাকে স্কুলে লুনাব গার্জেন তুমিই করেছিলে। উনি সঙ্গে করে ওকে আনতেই পারেন।

—এখন ওর কোন ছুটি নেই।

—তবু এনেছেন। লুনার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে চাও?

কারডোবের দেওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লুনা। স্যুটকেশ রাখা ছিল ওর পাশেই। এবার এগিয়ে এল। মিষ্টি চেহারায় লুনাকে বয়সের চেয়ে বড দেখায়। মা ও মেয়ে এখন মুখোমুখি।

—মাম্মা—

দু হাত বাডিযে দিয়েছে লুনা।

ঋতু ওকে জাড়য়ে ধরল। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল মুখ।

তারপর—

—তুমি এবার যেতে পারো দাদা। লুনা আমার কাছেই থাকবে।

ঋতু এগিয়ে গিয়ে স্যুটকেশ তুলে নিল। ঘরে ফিরে এসে রাকেশের মুখের উপব দরজা বন্ধ করে দিল। কুশল একই ভাবে বসেছিল সোফায়। শুনতে পেয়েছিল সব কথা। একটা অস্বস্তি ওর মনকে পাক দিয়ে চলেছে।

ঋতু খাটের উপর বসাল লুনাকে।

ওর চুল ঠিক করতে করতে ঋতু বলল, কেমন আছো বেবী?

লুনার স্পষ্ট উত্তর, ভাল নেই।

—কেন? কি হল আবার?

—তুমি আমাকে বিরক্ত করে তুলেছো।

—পাকা মেয়ে। আমি কি করলাম?

লুনা দ্রুত গলায় বলল, দাদু বলেছিলেন তুমি বিয়ে করেছো। কেন তুমি বিয়ে করবে?

ঘরে আকাশ ভেঙে পড়ল।

আট বছরের মেয়ের মুখ থেকে এই ধরনের কথা আশা করা যায না। যদিও লুনা স্মার্ট মেয়ে, পরিষ্কার ভঙ্গীতে কথা বলে, তবু এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, মামার বাড়ির লোকেরা আচ্ছামত ওর ব্রেনওয়াস করেছে।

ঋতু অসহায় দৃষ্টিতে কুশলের দিকে তাকাল।

লুনা আবাব বলল, তুমি চুপ করে কেন আছো মাম্মা? বল না, কেন তুমি

বিয়ে করলে ?

—তোমার জন্য বেবী। সকলের পাপা আছে, তোমার নেই। তাইতো তোমার জন্য পাপা আনলাম।

—চাই না আমার পাপা।

—ওকথা বলতে নেই। পাপা না থাকলে আমাদের কে আগলে রাখবে ?

অস্থির ভঙ্গীতে লুনা বলল, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। মাম্মা, শুধু তুমি থাকবে, আর কেউ নয়।

—গত বছর ভেকেসনে এসে তুমি একটা কথা বলেছিলে মনে আছে ?

—কোন কথা ?

—তুমি বলেছিলে সকলের পাপা স্কুলে যায়, কত প্রেজেণ্টেসন দেয়। তোমার মন খারাপ হয়ে যায় তখন।

—বলেছিলাম। তাতে হয়েছেটা কি ?

—তোমার কথা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই তো তোমার জন্য পাপা নিয়ে এলাম। এবার থেকে তোমার স্কুলে যাবেন উনি। কত প্রেজে-ণ্টেসন দেবেন। ভালবাসবেন তোমাকে।

—ভালবাসা আমার চাই না।

—ও ভাবে বলতে নেই।

—আমি বলবো।

—বেবী—

—বকছো কেন আমাকে ? একটা বাজে লোককে আমায় পাপা বলতে হবে ? আমি বলবো না—বলবো না—

ঋতুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

দু হাত দিয়ে কয়েকবার লুনাকে ঝাঁকুনি দিল।

—তুমি ভেবেছোটা কি ? মামার বাড়ির লোকেরা যা বুঝিয়েছে তাই বলবে ?

লুনার দু চোখে জল।

—তুমি আমাকে মারলে মাম্মা—

কথা শেষ করেই বিছানার উপড় উপুর হয়ে পড়ল। কান্নায় ভেঙে পড়ল তারপর। অসহায় দৃষ্টিতে ঋতু স্বামীর দিকে তাকাল। এত তাড়াতাড়ি যে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে একেবারেই বুঝতে পারেনি। জ্বলন্ত বাস্তবকে এখন কি ভাবে পাশ কাটাবে ?

—বেবী, শোন—

কোন উত্তর নেই। একটানা কান্না।

—শোন বলছি—লক্ষ্মী মেয়ে—শোন আমার কথা—

—শুনবো না—

কুশল খাটের কাছে এগিয়ে এসেছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। তবু মন বলছে, কিছু একটা করা দরকার। ঋতু ওর একটা হাত চেপে ধরল।

—বেঞ্চ, সকলে আমার পিছনে লেগেছে। আমি এখন কি করবো—আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

কুশল কিছু না বলে দু হাত দিয়ে লুনাকে তুলে নিল। ছটফট করতে লাগল—তারপর কুশলের কাঁধে মাথা রেখে একটানা কেঁদে চলল। ওর কান্নায় দুজনের কেউ বাধা দিল না।

কয়েক মিনিট পরে—

কুশল নরম গলায় বলল, আমার দিকে তাকাও বেবী।

—তাকাবো না।

—আমি তোমার পাপা। আমাকে দেখো একবার।

—তুমি বিচ্ছিরি—আমার পাপা চাই না।

—বেশ তো। তুমি যা চাইবে তাই হবে। শুধু একবার আমার দিকে তাকাও।

—বলছি না, আমি তোমাকে দেখবো না।

—এত করে বলার পরও যখন শুনছো না, তখন আর কিছু বলবো না। আমার মত বিচ্ছিরি পাপা তোমার দরকার নেই, এই তো? তুমি তোমার মাম্মার কাছেই থাকো, আমি চলে যাচ্ছি।

কুশল ওকে খাটের উপর বসিয়ে দিল। আলতো ভাবে চুমু খেল একবার। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ডোরবেল বেজে উঠল এই সময়। দরজা খুলতেই দেখা গেল, বেয়ারা খাবার নিয়ে এসেছে। সেণ্টার পিসের উপর প্লেট সাজিয়ে রাখতে লাগল বেয়ারা। কুশল ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

—আর কিছু দরকার হবে ম্যাডাম?

ঋতু শান্ত গলায় বলল, না। দরকার পড়লে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

বেয়ারা বেরিয়ে যাবার মুখেই ঘরে এলেন ঋতুর মা ও বাবা। মন বিষিয়ে উঠল ঋতুর। এরা জোঁকের মত লেগে রয়েছে। এত কাণ্ডের পরও এদের শিক্ষা হল না, এটাই আশ্চর্যের বিষয়।

—তোমরা কেন এলে?

বাবা বললেন, লুনাকে নিতে এলাম।

—আমি জানতে চাই, লুনাকে কেন তুমি স্কুল থেকে পাটনায় নিয়ে এসেছো ?

—যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি।

তীক্ষ্ণ গলায় ঋতু বলল, তা তোমরা করতে পারো না। লুনা আমার মেয়ে। তার ভালমন্দ আমি দেখবো।

বাবা হুঙ্কার ছাড়লেন।

—তুমি আমার মেয়ে। আমার কোন্ ভাল কথাটা তুমি শুনেছো। লুনাও তোমার কোন কথা শুনবে না। ওকে নষ্ট করার সুযোগ তোমাকে দেব না। লুনা আমাদের সঙ্গে যাবে।

—একটা বাচ্চা মেয়েকে তার মার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে তোমাদের লজ্জা করেনি ? কি করেছি আমি—কেন তোমরা আমার পিছনে পড়ে আছো ?

—বেলেল্লার র আর কিছু বাকি রাখোনি।

—আমি ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছি, এটাই আমার অপরাধ। মা, তুমি চুপ করে আছো কেন ? তুমিও কিছু বল ?

মা বললেন, তুমি যা করেছো, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। মেয়েটাকে আর নষ্ট করে ফেলো না। ওকে আমরাই মানুষ করবো।

ঋতু গুম হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড।

পর্যায়ক্রমে মা এবং দাদামশাই-দিদিমার দিকে তাকাচ্ছে লুনা।

কুশল কোথায় চলে গেল কে জানে।

ঋতু ভেজা গলায় বলল, আমার মেয়েকে আমিই নষ্ট করে ফেলবো ?

বাবা বললেন, আমাদের তাই বিশ্বাস।

—লুনাকে নিয়ে যেতে চাও ?

—হ্যাঁ।

—বেবী, তুমি কি এদের সঙ্গে যেতে চাও ?

লুনা কিছু বলল না।

ঋতু আবার বলল, তুমি পাপা চাও না, মাম্মাকে নিয়েই-বা তুমি কি করবে ? তুমি ওঁদের সঙ্গে যাও বেবী। আমি মনে করবো আমার কোন মেয়ে নেই।

—আমি যাব না মাম্মা—

লুনা ঝাঁপিয়ে পড়ল ঋতুর উপর।

—আমি কোথাও যাব না। আমি তোমার কাছে থাকবো।

ঋতু দু হাত দিয়ে মেয়েকে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইল। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল ওর সারা মুখ। তারপর সজল চোখে তাকাল নিজের

কাবেলা সৃষ্টিকারী মা-বাপের দিকে।

—তোমাদের আর কিছু বলার আছে ?

মেয়েকে অগ্রাহ্য করে নাতনীর দিকে তাকালেন দিক্ষিত সাহেব।

—লুনা, এসো ভাই। এবার আমরা যাবো—

লুনা বলল, আমি যাবো না।

—তুমি বলেছিলে, মার সঙ্গে একবার দেখা করে আবার চলে আসবে আমাদের কাছে।

—তখন বলেছিলাম, এখন বলছি, আমি যাবো না।

ঋতু বলল, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত বাড়ছে। এবার তোমরা যাও।

মা বললেন, কাজটা ভাল হল না। বাচ্চা মেয়েটা বুঝতে পারছে না। ওর যদি ভাল চাও ওকে বোঝাও।

—আমি আবার বলছি, তোমরা এবার যাও। ভবিষ্যতে আমার কাছে আর এস না। সমাজে তোমাদের মাথা আরো হেঁট হবে। এস, বেবী—

—কোথায় মাম্মা—

—কোথাও একটা। এস—

লুনাকে নিয়ে ঋতু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও কুশলকে পাওয়া গেল না। মনে মনে উদ্বিগ্ন হল ঋতু। ও কি রাগ করেছে—দুঃখিত হয়েছে ? আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ফিরে এল ঘরে। সেণ্টার পিসের কাছে এসে, একটা চেয়ারে বসাল লুনাকে।

—তুমি এবার খেয়ে নাও।

—তুমি খাবে না মাম্মা ?

—না। এখন নয়।

—এস না, আমরা দুজন একসঙ্গে খেয়ে নি।

ঋতু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার হাজবেণ্ডকে আসতে দাও, তারপর খাবো।

—তুমি কার কথা বলছো মাম্মা ?

—যিনি তোমাকে আদর করে গেলেন। যাঁকে তুমি পাপা বলতে রাজী নও। উনি আমার হাজবেণ্ড বেবী। আমি তোমার মত অবুঝ হতে পারি না তো। ওঁর প্রতি আমার কিছু কর্তব্য আছে। তুমি খেয়ে নাও। উনি এলে তারপর আমি খাবো।

দুজনের খাবার দেওয়া ছিল। এখন তিনজনের খাবার দরকার। লুনা অন্য-মনস্ক ভাবে সেণ্টার পিসের উপর প্লেটে রাখা কোর্সগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঋতু এগিয়ে গেল কলিং পুল-এর দিকে। কুশল ঘরে এল এই সময়। ওর আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

লুনা মুখ তুলল।

ঋতু নরম গলায় বলল, কোথায় ছিলে তুমি?

কুশল অ্যাসট্রেতে সিগারেট গুঁজে নিয়ে বলল, ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলাম।

—কেন?

—একই ঘরে বেবী আমার সঙ্গে থাকতে চাইবে না। একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম।

—আমার খেয়াল ছিল না। একটা ঘরের দরকার। পেয়েছো?

—এখনও পাইনি। ম্যানেজার চেষ্টা করছেন। যদি না পাওয়া যায়, অফিসে চলে যাবো। ওয়েটিং হলে রাত কাটাতে অসুবিধা হবে না।

—ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায়ও তো আর কিছু নেই।

ঋতু এগুলো সুইচ বোর্ডের দিকে।

—মাম্মা—

—কিছু বলবে বেবী?

—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—বেয়ারাকে ডাকার ব্যবস্থা করছি। আরো একপ্রস্থ খাবার দিয়ে যাবে।

লুনা মুখ নীচু করল। বলল থেমে থেমে, এতে আমাদের তিনজনের হবে না?

—বেবী—

উচ্ছাসে ভেঙে পড়ল ঋতু।

—আমরা তিনজনে ভাগাভাগি করে খাবো বলছো?

—হ্যাঁ, মাম্মা। আমি, তুমি আর পাপা—

কথাটা শেষ করেই লুনা সেণ্টার পিসের উপর মাথা রাখল।

—সোনা মেয়ে আমার। আবার কান্না কেন? দেখ, পাপা তোমাকে কিছু বলছেন।

লুনা একই ভাবে ফুঁপিয়ে চলল। অনুশোচনার আবেগে ওর ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কুশল ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল। তারপর মুখ তুলে, রুমাল দিয়ে ওর চোখের জল মুছে দিতে লাগল। সন্তানের পাষাণ যে এত তাড়াতাড়ি [illegible]

যাবে কে ভেবেছিল! আনন্দে ঋতুরও চোখ ভীজে উঠেছে। মুখে হাসি টেনে কুশল ওর দিকে তাকাল।

আজ রামনরেশকে প্রথমে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা। সরকারী পক্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। রামনরেশ বেশ ঘাবড়ে গেছে মনে হয়। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি সে আগে হয়নি। গীতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞার পর পরিচয় ইত্যাদি শেষ হল। এবার সরকারী পক্ষ জেরা আরম্ভ করলেন।

ভর্মা : কতদিন ওখানে তুমি চাকরি করছো?

নরেশ : আট বছরের উপর।

ভর্মা : সেকেণ্ড ফ্লোরেই সব সময় তোমার ডিউটি থাকে?

নরেশ : সব ফ্লোরেই বদলী হতে হয়।

ভর্মা : সেকেণ্ড ফ্লোরে কতদিন আছো?

নরেশ : ছ মাসের উপর।

ভর্মা : আসামীর কাঠগড়ায় যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তাকে তুমি চেনো?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার। উনি ঋতু মেমসাহাব।

ভর্মা : ওঁর সঙ্গে তোমার কোথায় পরিচয় হয়েছিল?

নরেশ : আমাদের হোটেলের ২১৬ নম্বর ঘরে উনি ছিলেন। ঐ ফ্লোরেই আমার ডিউটি থাকে।

ভর্মা : এই বছরের ১২ই জানুয়ারী হোটলে কোন ঘটনা ঘটেছিল?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার। লোকেশ ট্যাণ্ডন নামে একজন বোর্ডার খুন হয়েছিলেন।

ভর্মা : মৃতদেহ প্রথমে কে দেখতে পায়?

নরেশ : আমি আর ঋতু মেমসাহাব।

ভর্মা : ব্যাপারটা কি হয়েছিল বল তো? আমি জানতে চাইছি, তোমরা মৃতদেহ কি ভাবে একই সঙ্গে দেখতে পেলে?

নরেশ : তখন বোধহয় সকাল সাড়ে ছটা। আমি ২১৯ নম্বর ঘরে চা দিয়ে ফিরছিলাম। ঋতু মেমসাহাব ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরুলেন। আমাকে চা নিয়ে আসতে বললেন নিজের ঘরে।

ভর্মা : তারপর—

নরেশ : কয়েক মিনিট পরেই আমি চা নিয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে গেলাম। আমাকে

পেয়ালায় চা ঢালতে বলে মেমসাহাব বাথরুমের দিকে গেলেন—তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম বাথরুমে একজন মরে পড়ে আছে।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডন ?

নরেশ : হ্যাঁ। পরে জানা গেল।

ভর্মা : এত সকালে মেমসাহাব ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরুচ্ছিলেন কেন ?

নরেশ : রাত্রে উনি ২১০ নম্বর ঘরেই ছিলেন।

ভর্মা : তুমি কি ভাবে জানলে ?

নরেশ : আমি ওকে রাত সাড়ে এগারোটার পর, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ২১ নম্বর ঘরে যেতে দেখেছি।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডনকে তুমি মেমসাহাবের ঘরে যেতে দেখেছিলে ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার।

ভর্মা : তখন রাত কটা ?

নরেশ : ঠিক সময় বলতে পারবো না। মনে হয় সওয়া দশটা সাড়ে দশটা হবে।

ভর্মা : তাহলে মেমসাহাব রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত নিজের ঘরেই ছিলেন। তারপর ২১০ নম্বর ঘরে চলে যান। সেখানেই রাতভোর থাকেন। সকাল ছটার পর আবার ফিরে আসেন নিজের ঘরে। এই কথাই তুমি বলতে চাইছো কি ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার।

ভর্মা : ২১০ নম্বর ঘরে কে ছিলেন ?

নরেশ : ব্যানার্জী সাহাব।

ভর্মা : কুশল ব্যানর্জী ?

নরেশ : নাম মনে পড়ছিল না। ঐ নাম।

ভর্মা : রাত সাড়ে এগারোটার পর যখন মেমসাহাব নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যানার্জী সাহাবের ঘরে যাচ্ছিলেন তখন উনি নিজের ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়েছিলেন ?

নরেশ : চাবি লাগিয়েছিলেন।

ভর্মা : কি ভাবে বুঝলে ?

নরেশ : আমি দেখলাম, দরজা বন্ধ করে চাবি উনি ভ্যানিটি ব্যাগে রাখলেন। তারপর ব্যানার্জী সাহাবের ঘরের দিকে এগুলেন।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডনকে তুমি জানতে ?

নরেশ : ওঁর ঘরে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল। দিলখোলা লোক ছিলেন।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে মেমসাহাবের কথাবার্তা হতে দেখেছো ?

নরেশ : একবার দেখেছি।

ভর্মা : কোথায় ?

নরেশ : সেকেণ্ড ফ্লোরের ঝুল বারান্দায়।

ভর্মা : তোমার ধারণায়, দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন ছিল ?

নরেশ : বেশ ভালই ছিল বলে আমার মনে হয়।

ভর্মা : এবার একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দাও। লোকেশকে কে খুন করেছে বলে তোমার মনে হয় ?

নরেশ : পুলিস তো বলছে ঋতু মেমসাহাবের কাজ।

ভর্মা : তোমার মত জানতে চাইছি ?

নরেশ : আমি আর কি বলবো স্যার।

ভার্মা : আমি তোমার মত জানতে চাইছি। উত্তর দাও ?

নরেশ : আমারও তাই মনে হয়।

ভর্মা : কি মনে হয় তোমার ?

নরেশ : পুলিস ঠিকই সন্দেহ করেছে। ঋতু মেমসাহাবই দোষী।

ভর্মা : কেন খুনটা হল বলা তো ?

নরেশ : মেয়েমানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় এরকম হয়।

ভর্মা : ব্যানার্জী সাহাবের হাত আছে এতে ?

নরেশ : থাকতেও পারে। সঠিক কিছু বলতে পারবো না।

রণধীর ভর্মা আর কোন প্রশ্ন করলেন না। আসন গ্রহণ করলেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন রামনরেশের দিকে।

আহুজা : তোমাদের হোটেলে অ্যাটেণ্ডেস রেজিস্ট্রার আছে ?

নরেশ : আছে স্যার।

আহুজা : ঐ রেজিস্ট্রার কোন্ কাজে লাগে ?

নরেশ : আমরা যখন ডিউটিতে আসি তখন রেজিস্ট্রারে সই করি।

আহুজা : তার মানে ডিউটিতে এলে সই করতেই হবে ?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার ? সই না করলে গরহাজির করে দেবে। মাইনে কাটা যাবে।

আহুজা : কিছুক্ষণ আগে সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে তুমি যা বলছো তোমার সব মনে আছে তো ?

নরেশ : মনে আছে।

আহুজা : ইওর অনার, হোটেলের কিছু খাতাপত্র একজিবিট হিসাবে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে। অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রার জেরা করার ব্যাপারে আমার প্রয়োজন পড়বে।

বিচারপতি সম্মতি জানালেন।

নরেন্দ্র আহুজার সহকারী পেস্কারের ডেস্কের উপর থেকে রেজিস্ট্রার এনে নিজের সিনিয়ারের হাতে দিল। আহুজা রেজিস্ট্রারের পাতা উল্টে উল্টে কি দেখলেন। তারপর আঙুল দিয়ে একজায়গায় মার্ক রেখে রামনরেশের দিকে তাকালেন।

আহুজা : আদালতে দাঁড়িয়ে তুমি এতক্ষণ অনেক মিথ্যা কথা বলেছো?

নরেশ : আমি কোন মিথ্যা কথা বলিনি।

আহুজা : সরকারী উকীলের উচিত ছিল তোমাকে জানিয়ে রাখা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া বড় রকমের অপরাধ।

রনধীর দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : ইওর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু, অল্পশিক্ষিত সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করবার চেষ্টা করছেন।

আহুজা : আকাশে কেল্লা আমি বানাই না। ইওর অনার, হাতে প্রমাণ না থাকলে কাউকে চ্যালেঞ্জ করা আমার অভ্যাস নয়।

বিচারপতি : প্রসিড।

আহুজা : (রামনরেশের দিকে তাকিয়ে) তোমাদের হোটেলে একদিনে কটা সিফটে কাজ হয়?

নরেশ : তিন সিফটে।

আহুজা : এক একটা সিফট কখন থেকে কখন?

নরেশ : সকাল ছটা থেকে বেলা দুটো। বেলা দুটোর পর থেকে রাত দশটা। রাত দশটার পর থেকে আবার সকাল ছটার আগে পর্যন্ত।

আহুজা : ১১ই জানুয়ারী তোমার কখন ডিউটি ছিল?

নরেশ : সেদিন সকাল ছটা থেকে আমাকে ডিউটি করতে হয়েছিল।

আহুজা : বেলা দুটোর সময় তোমার ডিউটি শেষ হয়েছিল?

নরেশ : হ্যাঁ।

আহুজা : সেদিন তোমাকে ডবল ডিউটি করতে হয়েছিল?

ভীত ভাব নিয়ে রামনরেশ চুপ করে রইল।

আহুজা : চুপ করে থেকো না। তোমাকে ডবল ডিউটি করতে হয়েছিল?

নরেশ : না।

আহুজা : এতক্ষণ পরে তুমি একটা সত্যি কথা বললে। অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রার বলছে, সেদিন বেলা ছুটোয় ডিউটি শেষ করে, আবার তুমি পরের দিন সকাল ছটার সময় ডিউটিতে যোগ দিয়েছিলে।

রামনরেশের মুখে অসহায় ভাব ফুটে উঠল। উত্তর দেওয়ার বদলে খাবি খেতে লাগল।

আহুজা : ১১ই জানুয়ারী আর ১২ই জানুয়ারী, এই দুদিনই তোমার সকাল ছটা থেকে ডিউটি ছিল—তুমি সই করেছো। আমি ঠিক বলছি কিনা বলো?

নরেশ : ঠিক বলছেন।

আহুজা : হোটেলের ম্যানেজার জেরার উত্তরে বলেছেন, জল হাওয়া খারাপ হওয়ার দরুন ১১ই-১২ই রাত্রে ডিউটি করার জন্য কোন বেয়ারাকে পাওয়া যায়নি। কথাটা ঠিক?

নরেশ : হ্যাঁ, স্যার।

আহুজা : রাত্রে যখন তুমি ডিউটিতে ছিলে না তখন রাত সাড়ে এগারোটার সময় ঋতু মাথুরকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ২১০ নম্বর ঘরে ঢুকতে কি ভাবে দেখলে?

নরেশ চুপ করে রইল। অসম্ভব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ঘামের বন্যা যেন সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

আহুজা : চুপ করে থাকলেই দোষ ঢাকা পড়বে না। সেদিন ঋতু মাথুরের এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া কি ভাবে দেখলে?

নরেশ : আমি—আমি দেখিনি।

আহুজা : ঋতু মাথুর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে চাবি ভ্যানিটি ব্যাগে রেখেছিলেন, কথাটা ঠিক?

নরেশ : না।

আহুজা : হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের দক্ষিণের বারান্দায় মেমসাহাবের সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের কথা হচ্ছিল, তুমি লক্ষ্য করেছিলে?

নরেশ : আমি কিছু দেখিনি।

আহুজা : ঋতু মেমসাহাবের সঙ্গে তোমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল?

নরেশ : না।

আহুজা : তবে কেন সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে গেলে?

রামনরেশ নীরব রইল

আহুজা : এতগুলো মিথ্যা কথা কেন বললে ? চুপ করে থেকো না। বলো ?

নরেশ : বললে আমি ভীষণ বিপদে পড়বো।

আহুজা : না বললেও তোমার বিপদ কমবে না।

নরেশ : আমি আর কিছু বলতে পারবো না স্যার। আমায় মাফ করে দিন।

আহুজা মৃদু হেসে বিচারপতির দিকে তাকালেন।

আহুজা : সাক্ষীকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। ইওর অনার, সরকারী পক্ষের আমার মান্যবর বন্ধু, তাঁর নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে কি চিন্তা ভাবনা করছেন জানি না। আমার আদালতকে অনুরোধ, এই মিথ্যাবাদার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হোক। নইলে এই ধরনের সাক্ষীদের প্রভাবে ক্রমে ন্যায় বিচার পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

নরেন্দ্র আহুজা আসন গ্রহণ করলেন।

বিচারপতি গম্ভীর ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন। তাকালেন সরকারী উকীলের দিকে।

বিচারপতি : মিঃ আহুজা যা বললেন, তার তাৎপর্যকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। আপনি ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। আর কোন সাক্ষী আছে ?

রণধীর ভর্মা : আর একজনকে আজ উপস্থিত করতে চাই ইওর অনার।

বিচারপতি : বেশ লাঞ্চের পর আসুন।

কথা শেষ করেই বিচারপতি উঠে গেলেন।

বিচারকক্ষের অবস্থা তখন ভাঙা হাটের মত। এই আকর্ষণীয় মামলা শোনার জন্য প্রচুর ভীড় হয়। শুধু সাধারণ মানুষজনরাই নয়, দল বেঁধে আইনজ্ঞরাও আসেন। সকলে বেরিয়ে আসছেন। কুশলের সঙ্গে লুনা এতক্ষণ ছিল। আদালতের কার্যকরণ তাকে অবাক করে দিয়েছে। হোটেলে একা রেখে আসা যায় না। বাধ্য হয়েই তাই লুনাকে সঙ্গে আনতে হয়েছে।

বাইরে এসে আহুজা ওদের মুখোমুখি হলেন। মৃদু হেসে বললেন, কেমন বুঝছেন মিঃ ব্যানার্জী ?

হাসি মুখে কুশল বলল, ওয়েল প্লেড মিঃ আহুজা। ঠিক সময় আমরা ঠিক লোকের উপর নির্ভর করেছি।

—ধন্যবাদ। এই বাচ্চাটি—

—আমাদের। হস্টেলে ছিল। কাল এসেছে।

আহুজা লুনার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, মিসেস মাথুর—

ঋতু দ্রুত গলায় বলল, আমায় মিসেস ব্যানার্জী বলুন স্যার।

—ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন মামলায় শুধু মিসেস মাথুর। ওয়েল মিসেস ব্যানার্জী, আপনি চিন্তা করবেন না। যুদ্ধের মোড ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। চলি এখন—

উনি চলে গেলেন।

ঋতু বলল, বেবী, তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়ে গেছে?

লুনা বলল, হ্যাঁ, মাম্মা—

—গাড়িতে লাঞ্চ বক্স আছে। চল, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলি।

ওরা গাড়ির দিকে এগুলো।

এই সময় ব্রজ বর্মন এসে উপস্থিত হলেন।

তাঁর মুখে হেঁ হেঁ মার্কা হাসি।

কুশল বলল, আপনি আজ সাক্ষী দিচ্ছেন নাকি?

ব্রজবাবু বললেন, সমন পেয়েই তো আসছি। আমাকে এর মধ্যে জড়াবার কি দরকার ছিল?

—সত্যি কথা বলতে কি আমিও এর মানে বুঝতে পারছি না। ঋতু, ব্রজবাবু তোমার কর্মচারী, ওঁকে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করার অর্থ কি?

—আমিও ঐ কথাই ভাবছি। কি চাল থাকতে পারে এর মধ্যে?

—আমার কি মনে হয় জানো, পুলিস সাক্ষীর লিস্টে ব্রজবাবুর নাম ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নিয়মানুসারে এখন ওকে না ডেকে আর উপায় নেই।

ব্রজবাবু বললেন, ম্যাডাম, যে ভাবে বলবেন, আমি সেই ভাবেই সাক্ষী দেব।

—আমি কিছু বলবো না—ঋতু বলল, আপনি নির্বোধ নন। যা উচিত কথা, যা সত্যি কথা তাই বলবেন।

—আপনি ঠিকই বলছেন।

—আপনার খাওয়া হয়েছে ব্রজবাবু?

—আজ্ঞে, বাজার থেকে খেয়ে এসেছি।

—সন্ধ্যের সময় হোটেলে আসবেন। কাজকর্মের কথা কিছু হবে। ভাড়াটাড়া আদায় হচ্ছে তো?

—আজ্ঞে, সব আপটুডেট করে রেখেছি।

ব্রজবাবু চলে যাবার পর লুনা বলল, মাম্মা, তোমার জেল হয়ে যাবে?

ঋতু ওকে বলে রেখেছিল, মামারবাড়ির লোকেরা তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। মামলা করে জেলে পাঠাতে চায়।

—না, বেবী। উকীল আঙ্কল আমাকে বাঁচাবার জন্য কত চেষ্টা করছেন দেখছো তো। তাছাড়া তোমার পাপা রয়েছেন, আমাদের ভয় কি?

লুনা কুশলের দিকে ঘেঁষে দাঁড়াল।

বেলা আড়াইটার সময় ঋতুর ডাক পড়ল।

ও গিয়ে দাঁড়াল আসামীর কাঠগড়ায়।

সাক্ষীমঞ্চে ব্রজবাবুকে উপস্থিত করা হয়েছে। প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হল। পরিচয়ের পালাও।

ভর্মা: আপনি মাথুর পরিবারে কতদিন কাজ করছেন?

ব্রজবাবু: বারো বছরের ওপর।

ভর্মা: আপনার মালকিন ঋতু মাথুরকে তো আপনি ভালই চেনেন? কেমন মহিলা উনি?

ব্রজবাবু: চমৎকার। কর্মচারীদের ওপর ওঁর ব্যবহার দেখার মত।

ভর্মা: আমি ওঁর স্বভাব চরিত্রের কথা জানতে চাইছি?

ব্রজবাবু: বড ঘরের মহিলাদের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি।

ভর্মা: আপনি প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার ভাবে দিচ্ছেন না। দেওরদের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?

ব্রজবাবু: ভাল নয়।

ভর্মা: ভাল নয় কেন?

ব্রজবাবু: বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সব সময় টান-টান ভাব থাকতো।

ভর্মা: লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে অভিযুক্তার সম্পর্ক কেমন ছিল?

ব্রজবাবু: আমি যতদূর জানি কোন সম্পর্কই ছিল না।

ভর্মা: সম্পর্ক যদি না থাকবে তবে, বিয়ের কথা হচ্ছিল কি ভাবে?

ব্রজবাবু: একতরফা কথা স্যার। ম্যাডাম কখনই বিয়েতে মত দেননি।

ভর্মা: অভিযুক্তার চরিত্র সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, আপনি কি জানেন, কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে হোটেলে উনি রাত কাটিয়েছিলেন?

ব্রজবাবু: জানি।

ভর্মা: এরপরও বলছেন ওঁর চরিত্র ভাল?

ব্রজবাবু: হ্যাঁ, স্যার। এরপরও বলছি। উনি তো কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করেছেন। কোন রকম কেচ্ছাকেলেঙ্কারীকে টেনে নিয়ে যাননি।

ভর্মা: এত লোক অভিযুক্তা আর লোকেশকে জড়িয়ে এত কথা বলছে, সবা

মিথ্যা ?

ব্রজবাবু: কে কি বলছে আমার জানা নেই। আমি যা জানি তাই আপনাকে বললাম।

ভর্মা: আপনি স্মার্ট হবার অনর্থ চেষ্টা করছেন। আমার প্রশ্নের উত্তর সোজা এবং সরল ভাবে দিন।

ব্রজবাবু: আমি বৃদ্ধ লোক। স্মার্ট হবার চেষ্টা করে আমার লাভ কি ? আমি যা জানি তাই আপনাকে বলছি।

ভর্মা: লোকেশ ট্যাগুনের সঙ্গে অভিযুক্তার মেলামেশা যদি না থেকে থাকে তবে ঐ অসময়ে ওঁর ঘরে ট্যাগুন গেলেন কি ভাবে ?

ব্রজবাবু: আমি বলতে পারবো না।

ভর্মা: সম্পর্কহীন কোন পুরুষ কোন মহিলার ঘরে হুট করে যেতে পারে ? বিশেষ রাত সাড়ে দশটার পর ?

ব্রজবাবু: যেতে পারে না।

ভর্মা: উনি গিয়েছিলেন। এর কি উত্তর আছে আপনার কাছে ?

ব্রজবাবু: কেন গিয়েছিলেন জানি না। তবে ম্যাডাম ঐ সময় ঘরে ছিলেন না।

ভর্মা: কি ভাবে জানলেন ?

ব্রজবাবু: ম্যাডাম আমাকে বলেছিলেন দশটা আন্দাজ সময় ঘরে গিয়ে দেখা করতে। বেশী মাত্রায় বিয়ার খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিলাম। ধাতস্থ হবার পর দেখি দশটা কুড়ি হয়ে গেছে।

ভর্মা: তারপর কি হল ?

ব্রজবাবু: তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলাম ম্যাডাম ঘরে নেই। সকালে শুনেছিলাম উনি রাত্রে ব্যানার্জীবাবুর ঘরে ছিলেন।

ভর্মা: আপনি বলতে চাইছেন, রাত্রে ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে অভিযুক্তা একবারও নিজের ঘরে আসেননি ?

ব্রজবাবু: আমি তো তাই মনে করি।

ভর্মা: লোকেশ কি ভাবে মারা গেল তবে ?

ব্রজবাবু: ম্যাডাম এ কাজ করতে পারে না।

ভর্মা: কে এই কাজ করেছে ?

ব্রজবাবু: পুলিস ভাল ভাবে তদন্ত করলেই জানতে পারতো।

রণধীর ভর্মা এবার একটা লেডিজ রুমাল তুলে ধরলেন।

ভর্মা: এই রুমালটা কার ?

ব্রজবাবু: অন্ততঃ আমার নয়।

উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। এমন কি বিচারপতির ঠোঁটের কোনে হাসি দেখা দিল। ক্রুদ্ধ রণধীর ভর্মা একবার সকলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সাক্ষীমঞ্চের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন।

ভর্মা: ইয়ার্কি মারার জায়গা এটা নয়। আমি জানতে চাইছি এই রুমাল আপনার পরিচিত কিনা?

ব্রজবাবু: না।

ভর্মা: এটা লেডিজ রুমাল?

ব্রজবাবু: হ্যাঁ।

ভর্মা: ভাল করে দেখুন, এই লেডিজ রুমাল আপনার ম্যাডামের কিনা?

ব্রজবাবু: ম্যাডামের রুমাল সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই।

ভর্মা: আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অভিযুক্তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন আপনি। এই রুমাল মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডানের হাতে পাওয়া গিয়েছিল।

ব্রজবাবু: হতে পারে। আমি আগে যা বলেছি, এখনও তাই বলছি, এই রুমাল কার আমি জানি না।

রণধীর ভর্মা বুঝতে পেরেছিলেন পণ্ডশ্রম করে আর লাভ নেই। এই ধরণের সাক্ষীকে ভাঙা খুব শক্ত। ব্রজ বর্মনের নাম সাক্ষী তালিকায় যুক্ত করার জন্য মনে মনে পুলিসের মুণ্ডপাত করতে করতে বসে পড়লেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা: সরকারী পক্ষের বহুদর্শী আইনজ্ঞ আমার কিছু পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাই নয়, ব্রজমোহন বর্মনের মত একজন সাক্ষীকে উপস্থিত করে আমার কিছুটা উপকারই করেছেন। ধন্যবাদ। ইওর অনার, সাক্ষীকে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করছি না।

ব্রজবাবু সাক্ষীমঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

ফেরার পথে লুনা বলল, বর্মন অ্যাঙ্কাল তুমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে না?

ব্রজবাবু সকৌতুকে বললেন, কখন বল তো?

—যখন তুমি একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে। কোশ্চেনের অ্যান্সার দিচ্ছিলে।

—ও তখন, একদম ঘাবড়াইনি। বরং কালো কোট পরা লোকটাকে ঘাবড়ে দিয়েছি।

কথা বলতে বলতে কুশল আর ঋতু কয়েক পা এগিয়েছিল।

কুশল বলল, কাল আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

—কালই ?

—মিঃ আহুজার সহকারী তো তাই বললেন। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি ভাবছিলে তুমি ?

—কাল কোর্টে লুনাকে আনা চলবে না। কত রকম প্রশ্ন উঠতে পারে। ওর কানে ঐ সমস্ত কথা না যাওয়াই ভাল।

ঋতু বলল, ওকে একেবারেই কোর্টে আনা উচিত হয়নি। প্রথমেই আমরা ভুল করেছি।

—ঠিকই বলছো। কাল কি করা যায় ?

—ভি সি আর এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যাক। হোটেলে ও ব্রজবাবুর সঙ্গে সিনেমা দেখবে। সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসে।

কুশল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, মন্দ হবে না।

—বেঙ্গু—

—বলো ?

—বেবীর কাণ্ডকারখানায আমি ভীষণ দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু বলতেই হবে, ওর বাহাদুরী আছে। কি ভাবে নিজেকে সামলে নিল বল তো ? এখন তো তোমাকে রীতিমত পছন্দ করছে।

—আমি কিন্তু দমে যায়নি।

—কেন ?

—মা যাকে এত ভালবাসে, মেয়ে আজ নয় কাল তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না। এ বিশ্বাস আমার ছিল।

—বাবাঃ এত কনফিডেন্স।

কুশল কিছু না বলে হাসলো।

২১শ মে। ১৯৯০ ॥

প্রথমে কুশলকে নয়, বেলা সাড়ে এগারটার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হল, এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টের বেয়ারাকে। যথা নিয়মে মিথ্যা কথা না বলার প্রতিজ্ঞা তাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হল।

ভর্মা : তোমার নাম ?

সাক্ষী : ওসমান ইলাহি।

ভর্মা : আজ তোমাকে সাক্ষী দিতে এখানে কেন ডাকা হয়েছে জানো ?

ইলাহি : এয়ারলাইন্স হোটেলে একজন খুন হয়েছেন। আমাকে তাই এখানে ডাকা হয়েছে। আল্লাহুর নাম করে বলছি সাব, আমি কিছুই জানি না। ঐ হোটেলে কাজও করি না।

ভর্মা : এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? খুনের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে কে বলল? এখানে তুমি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে যা তুমি জানো। সামনের দিকে তাকাও। ঐ মহিলাকে তুমি চেনো?

ইলাহি পূর্ণ দৃষ্টিতে ঋতুর দিকে তাকাল।

ইলাহি : ওঁকে আমি জানি।

ভর্মা : ওঁর নাম কি?

ইলাহি : তা বলতে পারবো না।

ভর্মা : জানো বলছো। কি ভাবে ঐ মহিলার সঙ্গে তোমার জানাজানি হল?

ইলাহি : উনি অনেক দিন ধরে পাটনা আর কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করেন। এয়ারপোর্টে এলেই কফি খেতে আসেন রেস্টুরেণ্টে। প্রায়ই দেখি বলেই ওঁকে জানি।

ভর্মা : ওঁর সম্পর্কে আর কি জানো?

ইলাহি : বুঝতে অসুবিধা হত না, উনি ধনী পরিবারের মহিলা।

ভর্মা : এই মহিলাকে শেষবার কবে দেখেছো?

ইলাহি : কয়েক মাস আগে। সেদিন খুব ঝড়জল হচ্ছিল। উনি এসেছিলেন রেস্টুরেণ্টে। অনেকক্ষণ ছিলেন।

ভর্মা : সেই দুর্যোগপূর্ণ সন্ধ্যার সব কথা মনে আছে তোমার?

ইলাহি : মোটামুটি মনে আছে।

ভর্মা : আমি তোমায় তারিখটা মনে করিয়ে দিচ্ছি, সেদিন ছিল ১১ই জানুয়ারী। অভিযুক্তা একাই রেস্টুরেণ্টে এসেছিলেন?

ইলাহি : সঙ্গে একজন বুড়ো মত লোক ছিল।

ভর্মা : তারপর কি হল?

ইলাহি : বুড়ো লোকটাই এক কাপ কফির অর্ডার দিল। কফি নিয়ে এলাম। বুড়ো লোকটাকে মহিলা কিছু খোঁজ নেবার জন্য পাঠালেন।

ভর্মা : মহিলা ওখানে বসে রইলেন?

ইলাহি : হ্যাঁ, সাব। অন্যমনস্ক ভাবে উনি কফি খেতে লাগলেন।

ভর্মা : কফি শেষ হবার পর উনি চলে গেলেন?

ইলাহি : না সাব ওঁর টেবিলের দুটো টেবিল পরে দুজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন,

মহিলা তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মনে হল খুব পরিচিত। একজন চলে যাবার পরে, উনি দ্বিতীয়জনকে সঙ্গে নিয়ে কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন।

ভর্মা : এয়ারলাইন্স হোটেলে লোকেশ ট্যাণ্ডন নামে একজন খুন হয়েছিল। তার নাম তুমি শুনেছিলে ?

ইলাহি : লোকেশবাবুকে আমি চিনি। বিনোদবাবুর শালা। ওঁরা অনেক দিন থেকে যাওয়া-আসা করছেন। ভাল টিপস দিতেন।

ভর্মা : অভিযুক্তা বিনোদবাবুর আত্মীয়া তুমি জানতে ?

ইলাহি : আগে জানতাম না। সেদিনই বুঝতে পারলাম।

ভর্মা : সেদিন সন্ধ্যায় লোকেশবাবু রেস্টুরেণ্টে এসেছিলেন ?

ইলাহি : বিনোদবাবু আর তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে এসেছিলেন।

ভর্মা : তারপর কি হল ?

ইলাহি : সেই বুড়ো লোকটা এসে পড়েছিল এই সময়। মহিলা তাকে প্লেন কখন ছাড়বে খোঁজ নিতে বললেন। তারপর নিজেও বেরিয়ে গেলেন।

রণধীর ভর্মা বিচারপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, ইওর অনার, ডিফেন্সের অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী এই গুরুত্বহীন সাক্ষীকে মামলার সঙ্গে যুক্ত করার অনুরোধ কেন জানিয়েছিলেন বোঝা দুষ্কর। আদালতের সময় নষ্ট ছাড়া নিট ফল আর কিছু পাওয়া গেলো না। এই সাক্ষীকে আমার কোন প্রশ্ন নেই।

ভর্মা বসে পড়তেই আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা : ইওর অনার, কোন সাক্ষী গুরুত্বপূর্ণ আর কে নয়, অনেকের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। সাক্ষী ওসমান ইলাহিকে আমি দুটো মাত্র প্রশ্ন করবো। সঠিক উত্তর যদি পাওয়া যায়, তবে বুঝতে অসুবিধা হবে না, মামলার একটা দিক কত পরিষ্কার হয়ে গেলো।

আহুজা ওসমান ইলাহির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আহুজা : ওসমান, সেদিন সন্ধ্যায় অন্যান্যদের সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডন যখন এই মহিলার কাছে এসেছিলেন তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

ইলাহি : আমি ওখানেই ছিলাম সাব। বিল নিয়ে গিয়েছিলাম।

আহুজা : এবার ভেবে উত্তর দাও। লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে মহিলার কোন কথা হয়েছিল ? কথা হয়ে থাকলেও কে কি বলেছিলেন, তোমার মনে আছে ?

ইলাহি : মনে আছে সাব। সে সাব চলে গিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে লোকেশবাবু কিছু বলতেই মেমসাহাব রেগে গিয়েছিলেন। জোর গলায় বলে-

ছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেন মাথা না গলানো হয়।

আহুজা : ধন্যবাদ।

সাক্ষী হিসাবে কুশলের ডাক পড়ল লাঞ্চের পর। লুনাকে আনা হয়নি। ব্রজবাবুর সঙ্গে সে ভি সি আর এ "বর্ণক্রি" দেখছে। আজকের দৃশ্য বাস্তবিকই বৈচিত্র্যে ভরা। আসামী'র কাঠগড়ায় ঋতু আর সাক্ষীমঞ্চে কুশল। প্রাথমিক ব্যাপার ইত্যাদির পর জেরা আরম্ভ হল।

ভর্মা : অভিযুক্তাকে আপনি চেনেন ?

কুশল : খুব ভাল ভাবে। উনি আমার স্ত্রী।

ভর্মা : কবে বিয়ে হয়েছে আপনাদের ?

কুশল : এই বছরের ২৩শে জানুয়ারী।

ভর্মা : অভিযুক্তা মাথুর পরিবারের বিধবা বধূ ছিলেন। হঠাৎ ওকে বিয়ে করে বসলেন কেন ?

কুশল : আপনি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন কেন বুঝতে পারছি না। ইওর অনার আমি কি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ?

বিচারপতি : এই মামলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোন প্রশ্ন না করাই ভাল।

ভর্মা : ইওর অনার, যাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলা হচ্ছে, এই মামলায় তার প্রয়োজন আছে। লোকেশ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে নারীঘটিত ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নেই। ওয়েল মিঃ ব্যানার্জী, একজন বিধবা মহিলাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন কেন ?

কুশল : বিয়ে আমাদের বহু বছর আগেই হতে পারতো। সামাজিক বাধা আর অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হয়নি। এখন আর কোন বাধা ছিল না, তাই আমরা বিয়ে করলাম।

ভর্মা : বাধা ছিল না কি রকম ? লোকেশ ট্যাণ্ডন তো আপনাদের দুজনের মধ্যে চাইনিজ ওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কুশল : লোকেশ ট্যাণ্ডনকে আমি চিনতাম না। জীবন্ত লোকেশ ট্যাণ্ডনকে চাক্ষুষ করার নাম মাত্র সুযোগও আমার হয়েছিল। এমন একজন ব্যক্তি আমাদের দুজনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন কেন ?

ভর্মা : বাস্তব ঘটনা তাই। লোকেশ এবং অভিযুক্তার বিয়ে পাকা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আপনি এসে পড়ায় পুরনো প্রেম চাগাড় দিয়ে উঠল। অভিযুক্তা আপনার দিকে অসম্ভব ঝুঁকে পড়লেন।

কুশল : বাস্তবে তা ঘটেনি।

ভর্মা : বাস্তবে কি ঘটেনি ?

কুশল : ঋতুর সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের কোন সম্পর্কই ছিল না। সে তাঁকে কখনই বিয়ে করেতে চায়নি। কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের এই রকম ইচ্ছে ছিল।

ভর্মা : আপনাকে যা বোঝানো হয়েছে, আপনি তাই বুঝেছেন। লোকেশ যদি বাধা না হবে, তবে সে খুন হল কেন ?

কুশল : খুনের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই।

ভর্মা : আপনি বলতে চাইছেন, পুলিস অকারণেই অভিযুক্তার বিরুদ্ধে কেস সাজিয়েছে।

কুশল : পুলিস অতীতে অজস্র কেস সাজিয়ে আদালতে উপস্থিত করেছে। তার অধিকাংশই বাতিল হয়ে গেছে আপনার অজানা নয়।

ভর্মা : সাক্ষীর দায়িত্ব ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন আপনি।

কুশল : একেবারেই নয়। আপনি আমার কথার ভুল অর্থ করছেন মিঃ প্রসিকিউটার।

ভর্মা : ওয়েল, এবার আমরা ১১ই জানুয়ারীতে ফিরে যেতে পারি। এয়ার-লাইন্স হোটেলের কত নম্বর ঘরে সেদিন আপনি ছিলেন ?

কুশল : দুশো দশ নম্বর ঘরে।

ভর্মা : অভিযুক্তাকে দুশো ষোল নম্বর ঘর দেওয়া হয়েছিল। উনি নিজের ঘরে না থেকে, আপনার ঘরে রাতের আশ্রয় নিলেন কেন ?

কুশল : এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। বার বছর পরে আমাদের দুজনের দেখা হয়েছিল। অনেক কথা ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখার চাবিকাঠি আমরা পেয়ে গয়েছিলাম। এরপর ঋতুর আর নিজের ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়নি।

ভর্মা : একজন বিধবা মহিলা এবং একজন অবিবাহিত পুরুষের এই ভাবে রাত কাটানো কি উচিত কাজ হয়েছিল ?

কুশল : ক্ষমা করবেন। এই প্রশ্নে উত্তর আমি দেব না।

ভর্মা কিছু বলার আগেই আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা : অনধিকার চর্চা করার একটা সীমা থাকা উচিত। সরকারীপক্ষের মাননীয় প্রতিনিধি মামলাকে তাকে তুলে রেখে, পরের চরিত্রের খুঁত খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, ন্যায় হাতের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে এর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইওর অনার, এই ধরনের প্রশ্নে আমার গুরুতর আপত্তি আছে, আপনাকে জানিয়ে রাখা সমীচীন মনে করলাম।

বিচারপতি : আপত্তির যথার্থতা আমি স্বীকার করি। মিঃ ভর্মা, প্রশ্ন যাতে মামলার সীমা ছাড়িয়ে না যায় লক্ষ্য রাখবেন।

ভর্মা : এই মামলা এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে পড়তেই পারে। যা হোক। মিঃ ব্যানর্জী, অভিযুক্তা কটার সময় আপনার ঘরে এসেছিলেন ?

কুশল : রাত তখন সাড়ে দশটার কিছু বেশী হবে।

ভর্মা : উনি আপনার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন কখন ?

কুশল : সকালবেলা।

ভর্মা : আপনি তখন জেগে ছিলেন ?

কুশল : না।

ভর্মা : কি ভাবে বুঝলেন, উনি সকালে বেরিয়েছিলেন ?

কুশল : আমি জানি সকালেই ঋতু ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

ভর্মা : আপনি নিজেই বলেছেন, ঘুমচ্ছিলেন। কি ভাবে বুঝলেন, উনি মাঝ রাতে নয়, সকালে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন ?

কুশল : আমরা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলাম।

ভর্মা : রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেগে ছিলেন ? কোন মহৎ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন না কড়িকাঠ গুনছিলেন ?

কুশল : আমরা মনস্তাত্ত্বিক চাপে ছিলাম আগেই বলেছি। অজস্র কথা ছিল। আবেগের ব্যাপারটাও চেপে রাখা যায়নি। কোন্ দিক দিয়ে যে এত সময় কেটে গেছে বুঝতে পারিনি আমরা।

ভর্মা : আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি ?

কুশল : আমি মিথ্যা কথা বলছি তা কি আপনি প্রমাণ করতে পারবেন ?

ভর্মা : পাল্টা প্রশ্ন করবেন না। আমার কথার উত্তর দিন ?

কুশল : আমি যা বলেছি, বাস্তবে তাই ঘটেছিল।

ভর্মা : আপনার কথা মেনে নিলেও ঘটনার বাস্তবতা কিন্তু একই রকম থেকে যাচ্ছে। অভিযুক্তার ঘরে লোকেশ ট্যাণ্ডন গেলেন কি ভাবে ? তাঁকে ঢোকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল তাই তিনি ঘরের মধ্যে যেতে পেরেছিলেন। এই সুযোগ একমাত্র অভিযুক্তাই দিতে পারেন।

কুশল : ঋতু নিজের ঘরে চাবি লাগায়নি।

ভর্মা : ঘরে:দামী জিনিসপত্র ছিল। মহিলা চাবি বন্ধ না করেই আপনার ঘরে চলে গিয়েছিলেন ?

কুশল : ঘরে কোন দামী জিনিস বা টাকাপয়সা ছিল না। একটা অ্যাটাচি কেশ খান কয়েক জামাকাপড় আর প্রসাধনের জিনিস ছিল। তাছাড়া দামী হোটেলে চাবি দিয়ে দরজা দিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখা কোন ফ্যাক্টার নয়।

ভর্মা : অভিযুক্তা ধনী মহিলা। প্রচুর টাকা সঙ্গে থাকারই কথা। টাকার বাণ্ডিল নিয়েই উনি আপনার ঘরে গিয়েছিলেন ?

কুশল : না। টাকাপয়সা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমস্ত ওর কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মেনের হাতে ছিল। বড় ঘরের এটাই রেওয়াজ।

ভর্মা : লোকেশ ট্যাণ্ডন তাহলে দরজা খোলা পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিল ?

কুশল : হঁ্যা।

ভর্মা : ঐ অসময় একজন মহিলার ঘরে লোকেশ গেল কেন ?

কুশল : আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

ভর্মা : আপনি সত্যের অপলাপ করছেন। অভিযুক্তা তখন ঐ ঘরে ছিলেন। পরের ঘরে এসে কারুর পক্ষে লোকেশকে খুন করা সম্ভব নয়। আমার যুক্তিতে জোর আছে কিনা বলুন ?

কুশল : যে কোন যুক্তি যে কেউ খাড়া করতে পারে। আমি বলেছি ঋতু সারারাত আমার ঘরে ছিল। তাছাড়া তার মত মহিলার পক্ষে কাউকে খুন করে বাথরুমে টেনে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়।

ভর্মা : অভিযুক্তার একজন সহকারী কি থাকা সম্ভব নয় ?

কুশল : এক্ষেত্রে নয়। পুলিস চার্জসিটে দ্বিতীয় কোন নাম উল্লেখ করেনি।

ভর্মা ভেবে দেখলেন, শিক্ষিত এই সাক্ষীকে আর ঘাঁটালে তাঁর পক্ষেই অসুবিধা দেখা দিতে পারে। তিনি আর জেরার জের না টেনে বসে পড়লেন। নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন কুশলের দিকে।

আহুজা : মিঃ ব্যানার্জী, আপনি বলেছেন, রাত সাড়ে দশটার সময় আপনার ঘরে অভিযুক্তা গিয়েছিলেন। আপনি এও বলেছেন, সারারাত দুজনে একই ঘরে ছিলেন। একবারও বাইরে বেরোননি।

কুশল : হ্যাঁ। আমি তাই বলেছি।

আহুজা : সেরাত্রে আপনাদের দুজনের কিছু প্রয়োজন হয়েছিল ?

কুশল : প্রয়োজন ? মানে—

আহুজা : আমি জানতে চাইছি, এমন কিছুর দরকার পড়েছিল কি, যা আপনার ঘরে ছিল না ?

কুশল : ও, হ্যাঁ গরম জলের দরকার পড়েছিল।

আহুজা : কেন ?

কুশল : ঋতু মুখ ধুয়ে ফেলে উইণ্টার কেয়ার লোশান লাগাতে চাইছিল।

আহুজা : জল পেয়েছিলেন ?

কুশল : হ্যাঁ।

আহুজা : কি ভাবে পেলেন ?

কুশল : আমি বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকেছিলাম। কিন্তু কয়েকবার বেল বাজাবার পরও বেয়ারা আসেনি। তখন—

আহুজা : এক মিনিট। তখন রাত কটা ?

কুশল : রাত প্রায় এগারটা।

আহুজা : তারপর কি হল ?

কুশল : তখন আমি রুম সার্ভিসকে ফোন করলাম। ওখান থেকে একজন এসে জল দিয়ে গেল।

আহুজা : কটা বেজে ছিল তখন ?

কুশল : সাড়ে এগারটা বেজে গেছে ছিল।

আহুজা : ধন্যবাদ। আর কোন প্রশ্ন নেই।

ঋতু আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে এল। কুশল ওকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে এসে বসল। দুজনে ফিরে চলল হোটেলের দিকে। ঋতুকে এখন বেশ মনমরা দেখাচ্ছে। কুশল কিছু বলতে গিয়েও বলল না।

—বেঙ্গ—

—বলো ?

—আমায় তুমি ক্ষমা করো। আমার জন্যই তোমার এই হিউমিলেশন। সরকারী উকীল তোমাকে ছোট করবার কি রকম চেষ্টা করছিল বল তো ?

কুলশ মুখে হাসি টেনে বলল, এই কারণেই তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে ? কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছো, অকারণে তুমি কত হিউমিলেট হচ্ছ ? গ্রহের ফেরে পড়েছি আমরা। এই ধরনের অডস-এর মুখোমুখি হতে তো হবেই।

—আমি কি যে করবো ? কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

—আমার একটা কথা শুনবে ?

—তুমি কি জান না, তোমার যে কোন কথা শোনার জন্য আমি তৈরী হয়ে আছি।

—ঠিকই তো। আমি বলছিলাম, সমস্ত কিছু একপাশে সরিয়ে রেখে, প্রাণ খুলে হাসো। সেই হাসির জোয়ারে বেবি আর আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও।

ঋতু হেসে ফেলল।

—বেঙ্গ, তুমি সিরিয়াস হতে পারো না, না?

—অকারণে তো নয়ই। হাসি উচ্ছ্বাসের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়ে দেবার নামই হল জীবন। আমি অন্ততঃ তাই মনে করি মাই ডিয়ার।

কথা শেষ করেই কুশল মোড় ঘোরার জন্য স্টিয়ারিংএ মোচড় দিল।

সাক্ষী নেবার আজই শেষ দিন।

প্রথমে যে চিকিৎসক লোকেশ ট্যাণ্ডনকে পোস্টমর্টম করেছিলেন তিনি এবং পরে কেস তদন্তকারী পুলিস অফিসার পরিহার। ডাক্তারকে জেরা করতে উঠলেন রণধীর ভর্মা। মারকিউরিক ক্লোরাইডের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মৃত্যু কত দ্রুত হওয়া সম্ভব সে সম্পর্কেও মত নিলেন। তারপর তিনি আসন গ্রহণ করলেন। নরেন্দ্র আহুজা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

অর্থাৎ দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের সাক্ষী শেষ হল।

এবার সাক্ষীমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন পরিহার। পুরো ইউনিফর্মে এসেছেন তিনি। আদালতের অভিজ্ঞতা তাঁর ভালই। অতীতে বহু মামলার সাক্ষী তাঁকে দিতে হয়েছে। কাজেই ঘাবড়ে যাবার মনোভাব তাঁর মধ্যে তিলমাত্র নেই। প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি শেষ হবার পর রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা: ১১ ও ১২ জানুয়ারী রাত্রে এয়ারলাইন্স হোটেলে যে মার্ডার হয়েছিল তার তদন্ত আপনি করেছিলেন। অভিযুক্তা ঋতু মাথুরই যে হত্যাকারী এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?

পরিহার: আমি নিশ্চিত।

ভর্মা: কি ভাবে নিশ্চিত হলেন?

পরিহার: কেস তেমন জটিল ছিল না। প্রাথমিক তদন্তেই বুঝতে পেরেছিলাম কালপিটকে। এই কেস ট্র্যাঙ্গুলার লাভ অ্যাফেয়ার্সের পরিণতি।

ভর্মা: খুলে বলুন।

পরিহার: খোঁজখবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, অল্প বয়সে বিধবা হবার পর ঋতু মাথুর ভারী অস্বস্তির মধ্যে জীবন কাটাতেন। একদিন ওঁর দেওর বিনোদ মাথুরের শ্যালক লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে পরিচয় হল। তারপর প্রেম। দুজনের বিয়ের তোড়জোড় যখন চলছে তখনই অর্থাৎ ১১ই জানুয়ারী ১৯১০-এ অভিযুক্তার

অবিবাহিত জীবনের প্রেমিক কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে পাটনা এয়ারপোর্টে দেখা। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ভোল পাল্টালেন। ঝুঁকে পড়লেন ব্যানার্জীর দিকে। ব্যানার্জীর এতে আপত্তি হল না। কারণ এমন ধনবতী সহচরী চাইলেই পাওয়া যায় না।

ভর্মা: তারপর কি হয়েছিল?

পরিহার: লোকেশের বাধা তখন দুজনের কাছে ভারী বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। কাজেই তাকে দুনিয়া থেকে সরে যেতে হল।

ভর্মা: কি ভাবে খুনটা হয়েছে?

পরিহার: অভিযুক্তার কাছ থেকে ডাক পেয়ে লোকেশ রাত সাড়ে দশটা আন্দাজ সময় ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়েছিল। নিশ্চিত ভাবে মহিলা তখন তাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা: ইওর অনার, সাক্ষীর এই উক্তিতে আমার আপত্তি আছে।

বিচারপতি: অবজেশন সাবস্টেণ্ট।

ভর্মা: কি হল এরপর?

পরিহার: এই রকম পরিস্থিতিতেই কোন পানীয়ের সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে লোকেশকে খেতে দেওয়া হয়েছিল।

ভর্মা: লোকেশ মারা গেল। অভিযুক্তা তখন কি করলেন?

পরিহার: নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ২১০ নম্বর ঘরে চলে গেলেন। ঐ ঘর কুশল ব্যানার্জীর নামে বুক করা ছিল।

ভর্মা: আপনি ঋতু মাথুরকে কি ভাবে সন্দেহ করলেন?

পরিহার: কারণ কয়েকটাই ছিল।

ভর্মা: এক এক করে সেই কারণগুলো বলবেন কি?

পরিহার: এক, মোটিভ। দুই, মৃতদেহ ঐ ঘরে পাওয়া যাওয়া। তিন, মৃতের হাতের মুঠোতে ঋতু মাথুরের রুমাল। চার, ওঁর আত্মীয় পরিজনের বয়ান। পাঁচ, আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিণতি।

ভর্মা: এই কেশ সম্পর্কে আপনার আর কিছু বলবার আছে?

পরিহার: আমি আমার দীর্ঘ চাকরিজীবনে, কোন অভিজাত মহিলাকে প্রকাশ্যে এই ভাবে কাউকে খুন করতে দেখিনি।

ভর্মা: ধন্যবাদ।

রণধীর ভর্মা নিজের আসন গ্রহণ করলেন।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

আহুজা : এতক্ষণ আমি আপনার একের পর এক উত্তর শুনে, অবাক হয়ে ভাবছিলাম, পুলিস বিভাগের কতিপয় কর্মচারী নিজের গা বাঁচিয়ে, বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করে, কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার অভিনয় করে যান কি ভাবে ?

পরিহার : আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝলাম না।

আহুজা : বুঝতে ঠিকই পেরেছেন, স্বীকার করার মত সৎসাহস নেই। যা হোক, আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছেন, প্রাথমিক তদন্ত করেই বুঝতে পেরেছিলেন কালপিটকে। এই কথাই বলেছিলেন কি ?

পরিহার : বলেছিলাম।

আহুজা : গভীরভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি ?

পরিহার : না।

আহুজা : কেন ?

পরিহার : কেস একেবারেই জটিল ছিল না।

আহুজা : এবার দেখা যাক কেস কত সরল ছিল। অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল আপনি বলেছেন। এই রকম সম্পর্ক দুজনের মধ্যে সত্যি ছিল, তার কোন প্রমাণ আপনার হাতে আছে ?

পরিহার : অভিযুক্তার দুই দেওর আমাকে এ সম্পর্কে বলেছিলেন।

আহুজা : জেরার মুখে ওঁরা স্বীকার করেছেন ব্যাপারটা আদৌ সত্যি নয়। ওঁদের উক্তি আদালতে রেকর্ডেড হয়েছে।

পরিহার : কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি কি করতে পারি।

আহুজা : বটেই তো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোন খোঁজ খবর গভীর ভাবে না নিয়েই মিথ্যা বা বাজে কথার উপর নির্ভর করে যে কোন কেসে কনক্লুশানে আসতে পারেন আপনি।

পরিহার : ঠিক তা নয়।

আহুজা : তবে যা ঠিক তাই বলুন। শোনা কথা নয়। আপনি আদালতকে বলুন, কোন্ প্রমাণের জোরে আপনি নিশ্চিত হলেন, অভিযুক্তা ও লোকেশ ট্যাণ্ডনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

পরিহার কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না।

আহুজা : নীরবতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে কোন প্রমাণ আপনার হাতে নেই। আপনি বলেছেন, অভিযুক্তার কাছ থেকে ডাক পেয়ে লোকেশ রাত সাড়ে দশটার সময় ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়েছিল। কোন্ প্রমাণের জোরে আপনি এই সিদ্ধান্তে এলেন ?

পরিহার : প্রমাণ ? আমি বলতে চেয়েছিলাম—

আহুজা : এখন অন্য কোন কথা বললে গ্রাহ্য হবে না। অভিযুক্তা যে সত্যি লোকেশকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রমাণ দেখান।

পরিহার : এ সমস্ত ব্যাপার প্রমাণনির্ভর হয় না।

আহুজা : কোন সাক্ষীর নাম করুন, যিনি আপনাকে বলেছিলেন ব্যাপারটা ?

পরিহার এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনুমান করে নেওয়াই যথেষ্ট।

আহুজা : অনুমান। একজনের জীবনমরণ নির্ভর করবে আপনার অনুমাণের উপর ? আপনি বলেছেন, কাজ শেষ হবার পর অভিযুক্তা ২১০ নম্বর ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কোন সাক্ষী আছে যে দেখেছিল, অভিযুক্তাকে ২১৬ নম্বর থেকে ২১০ নম্বর ঘরে চলে যেতে ?

পরিহার : আছে। হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরেশ দেখেছিল।

আহুজা : না। সে দেখেনি।

পরিহার : সে নিজের স্টেটমেণ্টে একথা স্বীকার করেছে।

আহুজা : রামনরেশ মিথ্যা কথা বলেছে। গা ঘামিয়ে তদন্ত করলে আপনাকে এভাবে হাস্যাস্পদ হতে হত না। হোটেলের রেকর্ডস বলছে, সেদিন খারাপ জলহাওয়ার দরুন রাত্রে সেকেণ্ড ফ্লোরের জন্য বেয়ারা পাওয়া যায়নি।

পরিহার : কিন্তু রামনরেশ—

আহুজা : কোন বেয়ারাই যখন ডিউটিতে ছিল না তখন কে কোন্ ঘর থেকে বেরিয়ে কোন্ ঘরে গেল তার চাক্ষুষ কোন প্রমাণ নেই।

পরিহার কি বলবেন স্থির করতে পারলেন না। ঘামতে আরম্ভ করেছেন। এ রকমভাবে বেকায়দায় পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেন নি।

আহুজা : এবার বলুন চাক্ষুষ কোন সাক্ষী আছে কি নেই ?

পরিহার : আপনার কথা ঠিক হলে সাক্ষী নেই।

আহুজা : অভিযুক্তাকে আপনার কি রকম মনে হয়—নির্বোধ মহিলা ?

পরিহার : আমি চালাক চতুর বলে মনে করি।

আহুজা : এতক্ষণ পরে একটা ঠিক কথা বললেন। একজন চালাক চতুর মহিলা নিজের ঘরে লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে নিয়ে অন্যের ঘরে গিয়ে রাত কাটাবেন ?

পরিহার : অনেক সময় এরকম হয়।

আহুজা : সেই চালাক চতুর মহিলা, নিজের রুমাল মৃত ব্যক্তির হাতে রয়েছে দেখেও সরিয়ে ফেললেন না ?

পরিহার : হয়তো লক্ষ্য করেনি।

আহুজা : ঐ রুমাল যে অভিযুক্তার তার প্রমাণ কি ?

পরিহার : রুমাল অভিযুক্তার ছাড়া আর কার হতে পারে ?

আহুজা : আপনি বিনোদ ও প্রমোদ মাথুরের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন, ঐ রুমাল অভিযুক্তার কিনা ?

পরিহার : না।

আহুজা : অভিযুক্তার কর্মচারী ব্রজ বর্মনের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন ?

পরিহার : না।

আহুজা : রুমাল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আপনি অভিযুক্তাকে করেছিলেন ?

পরিহার : না।

আহুজা : অথচ আপনি স্থিরনিশ্চিত হলেন ঐ রুমাল অভিযুক্তার ! দেখা যাচ্ছে, আপনার সবই অনুমাননির্ভর ! লোকেশ ট্যাণ্ডনের কাঠামো কেমন ছিল ?

পরিহার : লম্বা ধাঁচের শক্তপোক্ত চেহারা ছিল।

আহুজা : অভিযুক্তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঐ মহিলার পক্ষে একজন দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান লোককে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব ?

পরিহার : খুনের ব্যাপারটা হয়তো বাথরুমেই ঘটেছে।

আহুজা : হয়তো ! আপনি অনুমানের উপর নির্ভর না করে এক পাও বাড়ান না দেখছি। মিঃ ইন্সপেক্টার, এখানে কিন্তু আপনার অনুমানও খাটছে না।

পরিহার : আমি আপনার কথা বুঝলাম না ?

আহুজা : কোর্টে আপনার যে ডায়রী সাবমিট হয়েছে, তাতে আপনি লিখেছেন, মৃতদেহ শোবার ঘর থেকে বয়ে নিয়ে গিয়ে বাথরুমে ফেলে রাখা হয়েছিল।

পরিহার নীরব রইলেন।

আহুজা : চুপ করে থাকবেন না। আমি যা বললাম, সে কথা আপনি ডায়রীতে লিখেছেন কিনা ?

পরিহার : লিখেছি।

আহুজা : আপনি বলেছেন, পানীয়র সঙ্গে মারকিউকরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে লোকেশকে খাওয়ানো হয়েছিল ?

পরিহার : হ্যাঁ।

আহুজা : পানীয় নিশ্চয় কোন গেলাসে ছিল ?

পরিহার : গেলাসে তো ছিলই। নইলে খাবে কি ভাবে ?

আহুজা : কোথায় সেই গেলাস ? একজিবিট হিসাবে কোন গেলাস আপনি আদালতে উপস্থিত করেননি।

পরিহার : গেলাস পাওয়া যায়নি।

আহুজা : খুঁজে দেখার চেষ্টাও করেননি। মারকিউরিক ক্লোরাইডের কোন কাচ বা প্লাস্টিকের ফাইল পেয়েছিলেন ?

পরিহার : না।

আহুজা : আপনি বলেছেন, লোকেশের বাধা তখন দুজনের কাছে ভারী বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল ? বলেছেন একথা ?

পরিহার : বলেছি।

আহুজা : দুজন বলতে আপনি অভিযুক্তা এবং কুশল ব্যানার্জীকে মিন করেছেন ?

পরিহার : হ্যাঁ।

আহুজা : আপনার মতে তাহলে, কুশল ব্যানার্জীও এই হত্যাকণ্ডের একজন অংশীদার ?

পরিহার : অবস্থা সেই রকমই দাঁড়িয়েছিল।

আহুজা : আপনাকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই ইন্সপেক্টার। কুশল ব্যানার্জী অভিযুক্তার সহযোগী, একথা মেনে নেবার পরও আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি। কেন ?

পরিহার : গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।

আহুজা : উচিত কর্মটা না করার কারণ কি ?

নিজের গাফিলতির সাজা পরিহার পাচ্ছেন।

অস্থির মন নিয়ে চুপ করে রইলেন।

আহুজ : বলুন, কেন গ্রেপ্তার করেননি ?

পরিহার : এখন আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

সহকারীর কাছ থেকে ওয়াটারবটল চেয়ে নিয়ে, কয়েক ঢোক জল খেয়ে নিলেন আহুজা। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালেন ইন্সপেক্টার পরিহারের সামনে।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড বস্তুটা কি ?

পরিহার : একধরনের পয়জন।

আহুজা : আপনি নিশ্চিত ?

পরিহার : আমি এই রকমই শুনেছি।

আহুজা : আপনি ভুল শুনেছেন। আপনার অপদার্থতার আরেকটা নিদর্শন !

মারকিউরিক ক্লোরাইড এক ধরনের সল্ট। তার সঙ্গে আরো কিছু রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে। ডায়রেক্ট পয়জন বলা চলে না। অতিমাত্রায় পেটে গেলে অন্য কথা। এই বস্তু সহজলভ্য ? যে কোন ওযুধের দোকানে পাওয়া যায় ?

পরিহার : না। বড় দোকানে পাওয়া যাবে।

আহুজা : পাটনা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোন বড় ওযুধের দোকান আছে ?

পরিহার : না।

আহুজা : কোন ছোট দোকান ?

পরিহার : না।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড অভিযুক্তা পেলেন কোথা থেকে ?

পরিহার : উনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

আহুজা : এতে আপনি কি প্রমাণ করলেন জানেন ? কোন্ কেশ কি ভাবে তদন্ত করতে হয় তার কণামাত্র জ্ঞান আপনার নেই।

পরিহার : আপনি ক্রমানয়ে আমাকে ছোট করবার চেষ্টা করছেন।

আহুজা : আপনি প্রকৃত অর্থে ই যে মহা অপদার্থ আমি আদালতের সামনে তাই উপস্থিত করার চেষ্টা করছি। সেদিন অভিযুক্তা এয়ারপোর্টে কটার সময় এসেছিলেন ?

পরিহার : সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ।

আহুজা : আপনি স্বীকার করেছেন তবু প্রশ্ন করছি, এয়ারপোর্টেই কি হঠাৎ দেখা হয়েগিয়েছিল অভিযুক্তার সঙ্গে কুশল ব্যানার্জীর ?

পরিহার : হ্যাঁ।

আহুজা : হত্যার যে মোটিভ আপনি খাড়া করেছেন তা তো আর টিকল না। আপনার কথামত কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হবার আগেই মাকিউরিক ক্লোরাইড নিয়ে অভিযুক্তা এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। সুতরাং ট্র্যাঙ্গুলার প্রেমের যে ফরমূলা আপনি আদলতের সামনে উপস্থিত করেছেন তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ কি না' দিন।

পরিহার ভারী মৃয়মাণ হয়ে পড়েছেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই মামলার রায় বের হবার সময় বিচারপতি তাঁকে ছেড়ে কথা বলবেন না।

এতক্ষণ পরে রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : ইওর অনার, প্রশ্ন এবং উত্তরের পালা তো শেষ হয়েছে। আবার 'হ্যাঁ' এবং 'না' এই নাটকের অবতারণা করার প্রয়োজন কি ?

আহুজা : প্রয়োজন আছে। নাটকের অবতারণা নয়, আমি ড্রপসিন ফেলার

আগে পুলিস পক্ষের খেয়ালখুশি মত তদন্ত করে, একজন অভিজাত মহিলাকে হ্যারাস করার নক্কারজনক দৃষ্টান্ত আদালতের সামনে উপস্থিত করতে চাইছি।

বিচারপতি : (সরকারী পক্ষের দিকে তাকিয়ে) অবজেকশন ওভাররুল। (আসামী পক্ষের দিকে তাকিয়ে) প্রসিড—

আহুজা : এখন আপনার মনে হচ্ছে কি, লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে অভিযুক্তার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল ?

পরিহার : বোধহয় ছিল না।

আহুজা : হত্যার মোটিভ তাহলে প্রেম-ভালবাসা নয় ?

পরিহার : বোধহয় নয়।

আহুজা : উত্তর দেবার সময় 'বোধহয়' কথাটা যোগ দিচ্ছেন কেন ? বলুন, সে রাত্রে অভিযুক্তাকে কোন বেয়ারা এ ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে দেখেছিল ?

পরিহার : না।

আহুজা : মারকিউরিক ক্লোরাইড যে অভিযুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে ?

পরিহার : না।

আহুজা : মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনের হাতে যে রুমাল পাওয়া গেছে তা ঋতু মাথুরের ?

পরিহার : হঁ্যা।

আহুজা : রুমাল যে ঋতু মাথুরের তা প্রমাণিত হয়েছে ?

পরিহার : না।

আহুজা : তদন্ত করার নামে আপনি ছেলেখেলা করেছেন তা স্বীকার করেন ?

পরিহার কিছু বলার আগেই রণধীর ভর্মা উঠে দাঁড়ালেন।

ভর্মা : আমার বিজ্ঞ সহযোগী প্রশ্নের নামে যা আরম্ভ করেছেন তাও তো ছেলেখেলার পর্যায়েই পড়ে। ইওর অনার, একজন পুলিস অফিসারকে হেয় প্রতিপন্ন করার এ এক চতুর অপচেষ্টা বলে আমি মনে করি।

বিচারপতি কিছু না বলে মৃদু হাসলেন।

আহুজা : সরকারী পক্ষের মনোমত প্রশ্ন উপস্থিত করতে না পারায় আমি দুঃখিত। এই মামলার চেহারা এখন সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ায় বন্ধুবর ক্ষুব্ধ তা আমি বুঝি। এবার আমি নিজের শেষ প্রশ্ন রাখছি। ইন্সপেক্টার এখন আপনি স্বীকার করেন কি, ঋতু মাথুর নয়, লোকেশ ট্যাণ্ডনের হত্যাকারী অন্য কেউ ?

পরিহার নীরব রইলেন।

আহুজা : আপনি আমার প্রশ্ন শুনেছেন। উত্তর দিন।

পরিহার : আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না।

নরেন্দ্র আহুজা মুখে হাসি টেনে বিচারপতির দিকে তাকালেন, তারপর পেছিয়ে এসে আসন গ্রহণ করলেন। এখন তাকে কঠিন যুদ্ধের পর জয়ী সেনাপতির মতই দেখাচ্ছে। এরপরই বিচারপতি জানতে চাইলেন, ডিফেন্সের সাক্ষী কাল থেকে উপস্থিত করা সম্ভব হবে কি না। আহুজা জানালেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থিত করার কোন প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করছেন না।

আরগুমেন্টের তারিখ পড়ল।

পরের দিন নয়—২০শে জুন।

সুপার ফাস্ট নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস।

দিল্লী ও গুয়াহাটির মধ্যে চলাচল করে। ঐ ট্রেনেই লুনাকে নিয়ে ঋতু আর কুশল নিউজলপাইগুড়ি পৌঁছেছিল। ওখান থেকে ট্যাক্সিতে চেপে কার্শিয়াং। লুনার এখনই স্কুলে ফেরার ইচ্ছে ছিল না। অনেক বুঝিয়ে ওকে রাজী করানো হয়েছে। সামনের উইন্টার ছুটিতে সকলে মিলে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে দিতে হয়েছে এই নিশ্চয়তাও।

লুনার গার্জেন হিসাবে স্কুলে লিখিতভাবে জানিয়েছিল ঋতু এবং লুনার দাদামশাই দীক্ষিত সাহেবের নাম। দীক্ষিত সাহেবের নাম বাদ দিয়ে কুশলের নাম দেওয়া হল। এবং জানিয়ে রাখা হল ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ যেন লুনার সঙ্গে দেখা করতে না পারে।

এবার ওরা ফিরে চলেছে।

নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসেরই এয়ারকণ্ডিশন করা দু-বার্থ-কুপে কম্পার্টমেন্ট। বেশ কিছুক্ষণ আগে মালদা পার হয়ে গেছে। আপার বার্থে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমচ্ছে কুশল। এতক্ষণ ঋতু একটা সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল। রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকাল, চারটে পঁচিশ। বাইরে গা পুড়ে যাওয়া জুন মাসের গরম। এ. সি কামরার মধ্যে থাকার দরুন ভারী সুখকর অনুভব।

ঋতু ম্যাগাজিন বার্থের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। কুশল একই ভাবে শুয়ে আছে। মনোরম আবেশ মনের মধ্যে ছায়া ফেলল। অকল্পনীয় ঘটনা সময় সময় নাটকীয় ভাবেই ঘটে যায়। হতাশার জীবন থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য কুশলই আবার আসবে কে ভেবেছিল?

ডান হাত দিয়ে ঋতু নাড়া দিল কুশলকে।

—এই—গ্রেট কুম্ভকর্ণ উঠে পড় এবার।

—উ—

—ওঠো বলছি। বেলা পড়ে এসেছে।

কুশল উঠে বসল। তারপর নেমে এল আপার বার্থ থেকে।

—কি ব্যাপার বল তো?

মুখে হাসি টেনে ঋতু বলল, আমি জেগে থাকবো, আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমবে। এটা কোথাকার বিচার?

—উল্টো চাপ দিচ্ছ? তুমিই তো আমাকে ঘুমতে পাঠালে।

—তাই বলে তুমি ঘুমের রেকর্ড করবে? আর ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে, ওল্টাতে শুধু তোমার কথা ভাববো আমি?

কুশল ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমরা দুজনে দুজনকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছি। সবেরই একটা অন্ত থাকে জান তো?

ঋতু ওর বুকে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চাইল।

—বেগু—

—বল?

—তোমার কি মনে হয় না, আমাদের এই সম্পর্কের গভীরতা অনন্তের সীমা-রেখাকে তচনচ করে এগিয়ে যাবে।

—তুমি হয়তো ঠিকই বলছো।

—মাঝে মাঝে তবুও কেমন ভয় ভয় করে।

—কেন?

—যদি আমার দীর্ঘমেয়াদী জেল হয়ে যায়? আমি তো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবো। তখন—

—তা হবে না।

কুশল ঋতুকে নিয়ে বার্থের উপর বসলো।

—তোমার নিজেরই বোঝা উচিত, জেল তোমার হবে না। মিঃ আহুজা কিভাবে সাক্ষীদের ভেঙেছেন আমরা দেখেছি। তারপরও যদি কিছু হয়, হাই-কোর্ট রয়েছে।

—আমার জেল হলে তুমি খুব ভেঙে পড়বে তাই না?

—না, ঋতু। আমি বরং আরেকটা বিয়ে করবো।

—আরেকটা বিয়ে করবে কেন?

কুশল ওর মুখে ঠোঁট বুলিয়ে নিয়ে বলল, আগে বিবাহিত জীবনের তাৎপর্য

বুঝতাম না। তুমি আমাকে রসের সাগরে চুবিয়ে দিয়েছো। এখন একটা বৌ না থাকলে আরেকটা বৌ আমার চাই।

ঋতু ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জেলের গরাদ ভেঙে ঠিক চলে আসবো। তারপর তোমার নতুন বৌকে ঝেঁটিয়ে বার করব বাড়ি থেকে। তারপর :তোমাকে—

আমাকে—কি করবে?

—কি করবো জানি না, তবে একটা কিছু করবো নিশ্চয়।

কথা শেষ করেই ঋতু হেসে ফেলল।

কুশলও হাসিতে যোগ দিল।

দুজনে দুজনকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত রইল। ঝড়ের বেগে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা গড়াবার পর কাটিহার পৌঁছবে। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় স্টেশন। কণ্ডাক্টারকে বলা আছে। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা সে কাটিহারে করে দেবে।

অনেকক্ষণ পরে কুশল সিগারেট ধরাল।

—ঋতু কফি খেলে কেমন হয়?

—মন্দ হয় না।

প্লাস্টিকের কাপে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে ঋতু কুশলকে দিল। নিজেও নিল এক কাপ।

—বেশ, একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের পাওয়া উচিত।

—কোন প্রশ্নের?

—লোকেশ ট্যাণ্ডনকে মারলো কে?

—আমিও ভেবেছি অনেক। কোন কূলকিনারা পাইনি। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত হয়েছি।

—কোন্ বিষয়ে?

কুশল কাপ নামিয়ে রেখে বলল, যে ঝামেলায় তুমি জড়িয়ে রয়েছো, তার জন্য দায়ী তুমি স্বয়ং।

—কি ভাবে?

—সে রাত্রে তুমি যদি দরজায় চাবি লাগিয়ে আমার কাছে চলে আসতে তবে, লোকেশ ট্যাণ্ডন তোমার ঘরে ঢুকতে পেত না। সে অন্যত্র কোথাও মারা পড়তো। দোষটা তোমার ঘাড়ে চাপতো না।

—ঠিক বলেছো। কিন্তু—

—এখন বল তো, সেদিন দরজায় চাবি বন্ধ না করেই কেন চলে এসেছিলে ?

ঋতুর মুখে বিচিত্র হাসি খেলে গেল।

—এর জন্য দায়ী তুমি।

কুশল অবাক হয়ে বলল, আমি ! কি ভাবে ?

—আমি যখন নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে তোমার কাছে যাওয়াই স্থির করলাম তখন দরজায় চাবি লাগাবার কথা মনে পড়েনি। আমার সমস্ত একাগ্রতা তখন শুধু তোমাকে ঘিরে রেখেছিল।

—তার ফল এখন তুমি ভুগছো।

—লোকসান যেমন হয়েছে, লাভও তো আমার কম হল না। কিন্তু লোকটা আমার ঘরে কেন গিয়েছিল বল তো ?

—মনে হয়, একান্তে দেখা করে তোমাম মন ভেজাতে গিয়েছিল।

—তোমার কথা মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। যখন দেখলো আমি ঘরে নেই তখন তো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল।

—খুব ভাল প্রশ্ন। তবে আমার কি মনে হয় জানো ?

—কি মনে হয় তোমার ?

—লোকেশ ট্যাণ্ডন তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল, কাছাকাছি কোথাও গেছো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। সে অপেক্ষা করছিল।

—এই সময় হত্যাকারী আমার ঘরে গিয়ে ঢোকে ?

—হতে পারে।

—হতে পারে বললে হবে না। নিশ্চিত হয়ে বল ?

কুশল হেসে ফেলল।

—পুরো ঘটনাটাই বিচিত্র ধাঁধায় জড়িয়ে রয়েছে। একটা অনুমান করতে পারি। যে কোন ভাবেই হোক, হত্যাকারী জানতে পেরেছিল তুমি ঘরে নেই—লোকেশ একাই রয়েছে।

—তারপর সে আমার ঘরে গিয়ে লোকেশকে শেষ করল, এই বলতে চাও তো ?

—হ্যাঁ।

—তার মানে হত্যাকারী শুধু লোকেশকে খুন করতে চায়নি, আমাকেও বিপদে ফেলার সুযোগ নিয়েছিল।

—এক ঢিলে চমৎকার ভাবে দুটো পাখী মেরেছে সে।

—বেশ, লোকটা কে হতে পারে ?

—লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে শত্রুতা ছিল এমন একজন কেউ। পুলিশ ভাল ভাবে তদন্ত করলেই তাকে চেনা যেতো। কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টাই হয়নি। আরো একটা ঘোরাল প্রশ্ন এখানে রয়েছে। লোকেশকে মারা হল কি ভাবে?

ঋতু বিস্ময়ের স্বরে বলল, কি ভাবে আবার? মারকিউরিক ক্লোরাইড খাইয়ে।

—সে তো জানা কথা। প্রশ্ন হল, কি ভাবে মারকিউরিক ক্লোরাইড ওকে খাওয়ানো হল? অন্যের ঘরে গিয়ে কেউ কাউকে চা বা সরবত খেতে দিতে পারে না।

—এমন তো হয়নি, নিজের ঘরেই মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো কিছু খেয়েছিল লোকেশ, মারা পড়েছে আমার ঘরে এসে?

ঋতুর হাত চেপে ধরল কুশল।

—ওয়াণ্ডারফুল। দারুণ মাথা খেলিয়েছো। তোমার অনুমানই ঠিক। এবার তাহলে দুজনের ওপর সন্দেহ এসে পড়ছে। বিনোদ মাথুর আর প্রমোদ মাথুর।

—তুমি ঠিক বলছো। কোন স্বার্থের ব্যাপার থাকতে পারে। এতক্ষণে আমরা সামাধানের কূলের কাছাকাছি পৌঁছেছি।

কুশল সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, তা বোধহয় নয়। আমার মন আবার বলছে, এখনও আমরা মাঝ গঙ্গায় রয়েছি।

—তোমার মন কিন্তু বাড়াবাড়ি করছে। এখনও আমরা মাঝ গঙ্গায় কেন রয়েছি?

—লোকেশ ছাড়া আরো একজন নিশ্চিত ভাবে তোমার ঘরে ঢুকেছিল। তা না হলে, ডেডবডি বাথরুমে গেল কি ভাবে? লোকেশের মুঠিতে রুমাল এল কোথা থেকে? কোর্টে প্রমাণ করা না গেলেও রুমালটা তো তোমার?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ছিল?

—ড্রেসিং টেবিলের ওপর রুমাল আর ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়চ্ছে কি? লোকেশ মারা যাবার পর, যে কোন কারণেই হোক হত্যাকারী তার বডি বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে। তারপর তোমাকে জড়াবার জন্য ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে তার মুঠিতে গুঁজে দেয়।

হতাশ ভঙ্গীতে ঋতু বলল, আমরা যেখানে ছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এলাম। একেই বোধহয় পারফেক্ট ক্রাইম বলে?

—পারফেক্ট ক্রাইম অবশ্য কোটিতে একটা হয়। এই ব্যাপারে ফাঁক একটা আছেই। আমরা ধরতে পারছি না আলাদা কথা। এছাড়া পুলিসের কারবারটা দেখো। আদালতে ইন্সপেক্টার আমাকেও তোমার সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করলো। অথচ আমাকে গ্রেপ্তার করার গরজ দেখায়নি। এই গাছাড়া ভাবের কারণ কি ?

ঋতু ওর কাঁধে মাথা রেখে বলল, কারণ যাই হোক তোমাকে যে গ্রেপ্তার করেনি, এটাই আমার সবচেয়ে বড লাভ।

ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এসেছিল।

সামনে কাটিহার না অন্য কোন স্টেশন ?

আজ আদালতকক্ষে জনসমাগম একটু বেশী। লোকেশ মার্ডার কেস বিশিষ্ট মামলায় পরিণত হয়েছে। তুই পক্ষের আবগুমেণ্ট কেমন হবে, তা জানার আগ্রহ অনেকেরই। আজকের ভীড সেই সংকেতই দিচ্ছে।

কাঁটায় কাঁটায এগারটার সময় বিচারপতি আসন গ্রহণ করলেন।

বিহার সরকার বনাম ঋতু মাথুরেব মামলার শুনানি প্রথমে আরম্ভ হল। বিচারপতি বোধহয় নিজের একাগ্রতা বজায রাখবার জন্য এই কেসের আরগুমেণ্ট প্রথমে শুনে নিতে চান। ডাক পাবার পরই ঋতু আসামীর কাঠগডায় গিয়ে থমথমে মুখ নিয়ে দাঁডাল। অজস্র জোডা চোখ তারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে ভাবলেই খারাপ লাগে।

রণধীর ভর্মা উঠে দাঁডালেন।

বিচারপতিকে অভিবাদন জানিয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, কেস নম্বর ৭৬/৯০-এর সাক্ষীর প্রকারণ শেষ হয়েছে। বিপক্ষের আমার বিজ্ঞ বন্ধু জানিয়েছেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষী তিনি উপস্থিত করতে চান না। আদালতের আদেশে কাজেই আজ আরগুমেণ্টের দিন ধার্য হয়েছে। ইওর অনার, আসামীর কাঠগডায় দণ্ডায়মান অভিজাত ঘরের ঐ সুন্দরী মহিলা একটি হত্যা-কাণ্ডের জন্য দায়ী, আপাতদৃষ্টিতে তা মনে না হলেও, আমি এবার তথ্য সহযোগে প্রমাণ করে দেব, প্রকৃত অর্থই ঐ জঘন্য অপরাধের জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী।

ইওর অনার, আমার মাননীয় বন্ধু তাঁর প্রাথমিক বয়ানে বলেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি ততক্ষণ দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন না, যতক্ষণ না তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে সিদ্ধ হচ্ছে। আমি তাঁর যুক্তি অস্বীকার করছি না। এবং এই

কথাও আমি স্বীকার করছি, অভিযোগ সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হলে অভিযুক্ত সন্দেহের লাভ পেয়ে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু ইওর অনার, পুলিস ডায়রী এবং সাক্ষীদের উক্তিতে এটা প্রমাণিত হয়েছে, "সন্দেহের লাভ" পাবার কোন সুযোগই অভিযুক্তা এই মামলায় পেতে পারে না। লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। ডাক্তারের সাক্ষী এবং পোস্টমর্টমের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, লোকেশকে মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল। যদিও এই হত্যাকাণ্ডর সময় অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। কেউ দেখেনি, কি ভাবে ওই তীব্র ভেষজ ভিক্টিমকে খাইয়েছিল হত্যাকারী। তবে স্বার্থ ও পরিস্থিতিগত বিষয়গুলি বিচার করলেই দেখা যাবে, এর জন্য একমাত্র দায়ী আসামী কাঠগড়ায় দণ্ডায়মানা অভিযুক্তা ঋতু মাথুর। আমার বিনম্র নিবেদন, বাদী পক্ষের সাক্ষীদের প্রথমেই সন্দেহের চোখে না দেখে সমগ্র বিষয়টিকে বিবেচনার আওতায় আনবেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, অভিযুক্তা নিজের বয়ানে বলেছেন, লোকেশ ট্যাণ্ডনের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা হচ্ছিল। একজন অভিজাত এবং ধনবতী বিধবা মহিলার বিয়ের কথা তথনই কারুর সঙ্গে হওয়া সম্ভব যখন প্রেম-ভালবাসার একটা ব্যাপার না থাকে। মনে রাখতে হবে, এটা নিগোসিয়েসন ম্যারেজের আওতায় পড়ে না। অভিযুক্তা আরো স্বীকার করেছেন, ১১ই-১২ই জানুয়ারী রাতে তিনি কুশল ব্যানার্জীর ঘরে ছিলেন। ইওর অনার, এটা নিশ্চিত ভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, মহিলা শুধু ফিকিল মাইণ্ডেড নন বেপরোয়া এবং সাহসীও। বড় ঘরের বিধবা বৌ হয়েও তিনি প্রাক্তন প্রেমিককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়েছেন এবং সেই পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হননি। এই চরিত্রের মহিলা কি ধরনের মনস্তত্বের অধিকার পেয়ে থাকেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তা অজানা নয়। এক্ষেত্রে লোকেশ ট্যাণ্ডন তখন অভিযুক্তার বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়েছিলেন। সেই বোঝাকে নির্মম ভাবে নামিয়ে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তিনি। বলা বাহুল্য এই পরি-কল্পনার সকল রূপ দিতে তার কোন অসুবিধে হয়নি।

এবার আমি অভিযুক্তার বিরুদ্ধে কোন্ কোন্ প্রমাণ সংগ্রহ করেছি তা আদালতের সামনে উপস্থিত করছি—

১। অ্যালিবাই তৈরী করার জন্য ১১ই-১২ই জুলাই অভিযুক্তার কুশল ব্যানার্জীর ঘরে রাত অতিবাহিত করা।

২। নিজের ঘরের দরজায় ইচ্ছাকৃত ভাবে চাবি বন্ধ না করা। যাতে পরে প্রমাণ হয়, দরজা খোলা পেয়ে লোকেশ ঘরে ঢুকেছিল, হত্যাকারী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অভিযুক্তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

৩। হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন, খারাপ জল-হাওয়ার দরুন সেকেণ্ড ফ্লোরের কোন বেয়ারাকে সে রাত্রে পাওয়া যায়নি। কিন্তু একথা বলেননি, প্রয়োজনে অন্য ফ্লোরের বেয়ারা সেকেণ্ড ফ্লোরে সারভিসিং দেবে না বা দেয়নি।

৪। কাজেই সে রাত্রে কোন হোটেল কর্মচারীর পক্ষে অভিযুক্তাকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কুশল ব্যানার্জীর ঘরে যেতে দেখা অস্বাভাবিক নয়।

৫। সকাল সাড়ে ছটার সময় অভিযুক্তা কুশল ব্যানার্জীর ঘর থেকে বেরিয়ে, করিডরেই বেয়ারাকে চা আনার আদেশ দিয়ে নিজের ঘরে চলে যান। কিন্তু স্বাভাবিক পথ না মাড়িয়ে তারপর তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে থাকেন। বেয়ারা আসার পর উনি বাথরুমে যাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এর একটাই অর্থ, লোকেশের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার সময় উনি একজন সাক্ষী চেয়েছিলেন।

৬। পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলার জন্য মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হয়। এই কাজ একা অভিযুক্তার পক্ষে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। একজন সহযোগীর প্রয়োজন হয়েছিল। পুলিসের অসাবধানতার দরুনই কুশল ব্যানার্জীকে এই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় এনে ফেলা যায়নি।

৭। কোন প্রমাণ নেই, সাক্ষী নেই—সে রাতের সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অভিযুক্তা ও কুশল ব্যানার্জী প্রেম প্রকরণে ব্যস্ত ছিলেন না, হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহ থেকে বাঁচার এই উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

৮। এত সাবধানতার পরও অভিযুক্তার রুমাল লোকেশ ট্যাণ্ডনের হাতে রয়ে গিয়েছিল। ঐ তল্লাটে আর কোন মহিলা ছিলেন না, কাজেই এক্জিবিট হওয়া রুমাল অভিযুক্তা ছাড়া আর কারুর নয়।

৯। আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি, কলকাতার হাওড়া ব্রীজ অ্যাপ্রোচ রোডে "নিরাময়" নামে বিশাল এক দোকানের কর্ত্রী অভিযুক্তা। কাজেই মারকিউরিক ক্লোরাইড সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য না হলেও অভিযুক্তার কাছে সহজলভ্যই ছিল।

১০। মোটিভ সম্পর্কে আদালত ইতিপূর্বেই ওয়াকিবহাল। তবু আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি এই মর্মন্তুদ ঘটনা। ঋতু মাথুর ময়লা কাপড়ের মতই লোকেশকে ত্যাগ করে কুশল ব্যানার্জীর প্রতি আগ্রহশীল হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল, লোকেশ পরে নিশ্চিত ভাবে ঝামেলা করবে। কাজেই তিনি এই ভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়েছেন।

ইওর অনার, পুলিস যে সমস্ত ধারা অভিযুক্তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত করেছে, অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করলেই তা সঠিক বলেই চিহ্নিত হবে। ধারা ৩০২-এর সঙ্গে ধারা ১২০ বি অত্যন্ত মানানসই। কারণ এই হত্যাকাণ্ড দৈবাৎ ঘটনা নয়, ষড়যন্ত্র করেই লোকেশ ট্যাণ্ডনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইওর অনার, অপরাধ প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোন ব্যক্তির সামনে ঘটবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যে সঙ্গীন অপরাধ করতে চলেছে তার প্রধান লক্ষ্য থাকে সকলের চোখ বাঁচিয়ে নিজের কায সিদ্ধ করা। কাজেই এমন কোন আইনগত নির্দেশ নেই যাতে বলা হয়েছে, চাক্ষুষ সাক্ষ্য না হলে অভিযুক্তাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না। স্থানবিশেষে পরিস্থিতিগত প্রমাণই যথেষ্ট। এই মামলায় উপযুক্ত পরিস্থিতিগত প্রমাণ অভিযুক্তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে রয়েছে। পুলিসের তদন্ত রিপোর্টে বা সাক্ষীদের মুখ থেকে এমন কোন কথাই জানা যায়নি, যাতে প্রমাণিত হয় অন্য কারুর স্বার্থে লোকেশ ট্যাণ্ডন বাধাস্বরূপ ছিল। স্বার্থ বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে অভিযুক্তা ঋতু মাথুরের চতুর্দিকে। একজন অভিজাত ঘরের শিক্ষিতা মহিলার বিস্ময়কর জঘন্য কার্যাবলী আইনের দায়রাকে সম্পূর্ণ তচনচ করে দিয়েছে। আদালতের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, অভিযুক্তাকে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে ন্যায়হিত রক্ষা করা হোক।

রণধীর ভর্মা নিজের আরগুমেণ্ট শেষ করে আসন গ্রহণ করলেন।

সম্পূর্ণ আদালতকক্ষে গম্ভীর নীরবতা বিরাজ করছে।

আসামী পক্ষের প্রখ্যাত অভিবক্তা কি ভাবে নিজের শুনানি আরম্ভ করেন, নিজের মক্কেলের পক্ষে কোন্, কোন্ যুক্তিকে তুলে ধরেন এবং কি ভাবেইবা নিজের বক্তব্যের উপর যবনিকা টানেন, তা শোনার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভাবে উৎসুক।

নরেন্দ্র আহুজা উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারপতির দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করলেন নিজের বক্তব্য : ইওর অনার, সরকারী পক্ষের আমার বন্ধু যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করেছিলেন, তাদের বয়ানকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে, যে পথ ধরে এগুবার চেষ্টা করলেন সত্যি তা বিস্ময়কর। এখানে মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন, ঐ সমস্ত সাক্ষীকে আসামী পক্ষ নয়, সরকারী পক্ষই আদালতে উপস্থিত করেছিলেন। পরিস্থিতিগত প্রমাণের কথা তুলে বাদী পক্ষের মাননীয় অভিবক্তা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রকৃত অর্থে কতটা যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কেই আমি প্রথমে নিজের বক্তব্য রাখতে চাই। এরপর সাক্ষীদের বয়ান পর্যালোচনা করা আমার দ্বিতীয় দফার বক্তব্য হবে।

ইওর অনার, এভিডেন্স অ্যাক্টের ধারা ৪ অনুসারে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যকে তখনই মেনে নেওয়া চলে যখন অভিযুক্ত নিশ্চিত ভাবে সন্দেহের বেড়াজালের মধ্যে বন্দী। ১৯১৯ সালের সুপ্রিম কোর্ট জার্নালের ১৩১২ পাতায় উল্লেখ আছে, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বেচারপতি মুর্তজা ফাজাল আলী এক মামলার রায় দেবার সময় বলেছিলেন, পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অভিযুক্তকে তখনই শাস্তি দেওয়া চলে যখন ঐ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এবং ঐ পরিস্থিতি অভিযুক্তকে নির্দেশ হবার সুযোগ দিচ্ছে না।

ইওর অনার, এই মামলায় পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য তেমন জোরাল নয়। এর চেয়েও সঙ্গীন পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট যে গভীর বিবেচনা বোধের পরিচয় দিয়েছেন তার একটি উদাহরণ এখানে আমি তুলে ধরতে চাই। ১৯৮১ সালের এ. আই. আর. জার্নালের ৭৬৫ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। শঙ্করলাল দীক্ষিত বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কয়েকটি সঙ্গীন পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য ছিল। যেমন—১। মৃতা মহিলার লাশ অভিযুক্তের ঘরে পাওয়া যায়। ২। অভিযুক্ত ঐ বাড়িতে একাই থাকতো। ৩। অভিযুক্তের দুজন পরিচিত বন্ধু দরজার কড়া বারংবার নাড়তে থাকে কিন্তু দরজা খোলা হয়নি। ৪। একজন পরিচিত পাশের বাড়ির ছাদে উঠে দেখে অভিযুক্ত উঠোনে শুয়ে আছে। তাকে বলার পরও সে দরজা খুলেতে রাজী হয় না। ৫। এরপর কোন রকমে প্রতিবেশীরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে, মৃতদেহ বাথরুমে পড়ে রয়েছে এবং উঠোনে নির্বিকার ভাবে শুয়ে আছে অভিযুক্ত। ৬। বাড়িতে এত লোক ঢুকে পড়ায় এবং এ-ঘর ও-ঘর তল্লাস চালানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত কোন বিস্ময় প্রকাশ করেনি। ৭। মৃতা যুবতীর প্যান্টি বালিশের নীচে পাওয়া গেল। ঐ বালিশে মাথা রেখেই অভিযুক্ত শুয়ে ছিল। ৮। অভিযুক্তের গুপ্তাঙ্গে এমন সমস্ত চিহ্ন ছিল, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, তাজা সহবাস হয়েছে।

এই সমস্ত পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে শঙ্করলাল দীক্ষিতের বিরুদ্ধে বলাৎকার এবং হত্যার অভিযোগ আনা হয়। বোম্বে হাইকোর্ট অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩০২ ধারায় ফাঁসির আদেশ দেন। যদিও শঙ্করলাল আদালতে বলেছিল, সে নির্দোষ। তার মা, ভাই এবং কয়েকজন প্রতিবেশী তাকে এই মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। হাইকোর্টে রায় হবার পর সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিল হল। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচুড়, বিচারপতি এ. পি. সেন এবং বিচারপতি বাহরুল ইসলামকে নিয়ে গঠিত এক বেঞ্চে এই মামলায় শুনানি হয়।

ঐ বেঞ্চ গভীর ভাবে নথিপত্র পর্যালোচনা করার পর অভিমত দিলেন, ঐ সঙ্গীন পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত কখনই নিজের বাড়িতে থাকতে পারে না। এছাড়া কেউ অপরাধ করার পর জোরাল প্রমাণ, মৃতার জাঙ্গিয়া নিজের বালিশের তলায় রেখে সেই বালিশে মাথা রেখে ঘুমবে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। সুতরাং এই দুর্বল পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না। তারা প্রাকারন্তরে একথাই বলেছেন, পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর অন্ধের মত নির্ভর না করে এমন বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে হবে যাতে এই সম্ভাবনা থাকে, এই ঘটনার একটা বিকল্প দিকও আছে।

ইওর অনার, এই মামলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে পরিস্থিতিগত সাক্ষ্যের উপর। অথচ এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারে না যে, সাক্ষীদের বয়ান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সরকারী পক্ষের আমার মাননীয় বন্ধু আদালতকে বিভ্রান্ত করার অক্ষম প্রয়াস করেছেন। এই মামলার যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করে, ন্যায়হিতকে কালো পর্দায় ঢেকে দেবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়েছেন। এবার আমি সরকারী পক্ষের সাক্ষীদের বয়ানের পর্যালোচনা করে বুঝিয়েছি আমার মক্কেল, অভিজাত মহিলা ঋতু মাথুর ন্যায়বিচার পাবার উপযুক্তা কিনা। এবার আমি সংখ্যা নির্দেশ করে সাক্ষীদের বয়ান বিশ্লেষণ করতে চাই—

১। এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন, খারাপ জল-হাওয়া থাকার দরুন, ১১ই-১২ই জানুয়ারী রাত্রে কোন বেয়ারাকে সেকেণ্ড ফ্লোরে ডিউটি করার জন্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া উনি বলেছেন, ২১৬ নম্বর ঘরে চাবি অভিযুক্তার কাছ থেকে নয়, পেয়েছিলেন ঐ ঘরের ড্রয়িং টেবিলের উপর থেকে।

২। ম্যানেজার আরো বলেছেন, লোকেশ ট্যাণ্ডন তাঁর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করলেও, ঋতু মাথুর ট্যাণ্ডন সম্পর্কে ইণ্টারেস্টেড কিনা, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

৩। বিনোদ মাথুর স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা একজন বুদ্ধিমতী মহিলা। কোন বুদ্ধিমতা মহিলা খুন করে মৃতদেহ নিজের ঘরে ফেলে রাখবেন না, এ যুক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

৪। বিনোদ মাথুর আমার যুক্তি মেনে নিয়ে আরো স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা লোকেশকে খুন করেননি।

৫। রাকেশ দীক্ষিত কুশল ব্যানার্জীর ওপর খুনের দায় চাপাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি। এমন কি পুলিসের কাছেও

ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাননি।

৬। যুক্তি মেনে নিয়ে আদালতে রাকেশ দীক্ষিত স্বীকার করেছেন ঋতু মাথুর খুন করেননি। কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই, একথাও তিনি মেনে নিয়েছেন।

৭। অভিযুক্তাকে এই মামলা থেকে বাঁচাবার জন্য রাকেশ দীক্ষিত, তাঁর মা-বাবা, দেওর বিনোদ ও প্রমোদ মাথুর কোন চেষ্টাই করেননি।

৮। ওঁরা যাঁকে একেবারেই পছন্দ করেন না, সেই কুশল ব্যানার্জী অভিযুক্তাকে বাঁচাবার সমস্ত রকম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

৯। প্রমোদ মাথুর স্বীকার করেছেন অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সম্পর্কে পরে যা বলেছেন তা সবই মিথ্যা।

১০। প্রমোদ মাথুর স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা বুদ্ধিমতী মহিলা। সুতরাং লোকেশকে খুন করে নিজের বাথরুমে মৃতদেহ ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

১১। মাথুর একথাও স্বীকার করেছেন, অভিযুক্তা স্বাধীনচেতা মহিলা। কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে বিয়েতে তিনি কারুর বাধাই মানতেন না। এক্ষেত্রে লোকেশ অভিযুক্তার পথের কাঁটা হওয়া অর্থহীন। এবং তাঁর কোন মোটিভ ছিল না।

১২। মাথুর একথাও স্বীকার করেছেন, দোহারা গড়নের লোকেশকে অভিযুক্তার পক্ষে শোবার ঘর থেকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

১৩। হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা রামনরেশ পুলিস এবং সরকারী পক্ষের একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। অথচ সে জেরার মুখে স্বীকার করেছে, সে রাত্রে সে ডিউটিতে ছিল না। ২১০ নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে গভীর রাতে অভিযুক্তাকে সে যেতে দেখেনি।

১৪। প্রত্যক্ষদর্শী রেস্টুরেন্টের বেয়ারা ওসমান ইলাহির কথায় জানা গেছে, অভিযুক্তা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন লোকেশকে।

১৫। মাথুর পরিবারের পুরনো কর্মচারী ব্রজমোহন বর্মনের কথায় জানা গেছে, অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশের কোন সম্পর্ক ছিল না।

১৬। কুশল ব্যানার্জী স্বীকার করেছেন সে রাত্রে অভিযুক্তার তাঁর সঙ্গে ২১০ নম্বর ঘরে ছিলেন। রুম সার্ভিসের লোক রাত সাড়ে এগারটার সময় একই ঘরে দেখেছে দুজনকে। অভিযুক্তার ঘরে কোন দামী জিনিসপত্র ছিল না। উনি একথাও বলেছেন, অভিযুক্তার টাকাপয়সা ইত্যাদি ব্রজমোহন বর্মনের কাছে ছিল।

১৭। ইন্সপেক্টর পরিহার স্বীকার করেছেন, এই কেস গভীরভাবে তদন্ত করার

প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেননি।

১৮। অভিযুক্তার সঙ্গে লোকেশ ট্যাণ্ডনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, এর কোন প্রমাণ ইন্সপেক্টারের হাতে নেই। অভিযুক্তা যে রাত সাড়ে দশটার পর ভিক্টিমকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তার কোন প্রমাণ বা সাক্ষী উনি উপস্থিত করতে পারেননি।

১৯। ইন্সপেক্টারের নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আদালতে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছে। হোটেলের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্ট্রারও সেই কথাই বলছে।

২০। ইন্সপেক্টার বলেছেন, পানীয়ের সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। অথচ উনি একজিবিট হিসাবে সেই গেলাস বা পেয়ালা আদালতে উপস্থিত করতে পারেননি।

২১। একজিবিট হওয়া রুমাল যে অভিযুক্তার তাও তিনি প্রমাণ করতে পারেননি। এমন কি ঐ রুমাল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কারুর কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেননি।

২২। এই হত্যাকাণ্ডে কুশল ব্যানার্জী একজন অংশীদার—একথা ইন্সপেক্টার আদালতে বলেছেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করেননি, তাঁর বিরুদ্ধে কোন চার্জ গঠন করেন নি।

২৩। মারকিউরিক ক্লোরাইড অভিযুক্তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, ইন্সপেক্টার তা বলতে পারেননি। তাঁর ট্র্যাঙ্গুলার প্রেমের ফর্মুলাটা যে ঠিক নয় তিনি জেরার মুখে তা স্বীকার করেছেন। প্রেম যে এই হত্যার মোটিভ নয় তাও তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে।

২৪। প্রমাণিত হচ্ছে, এই মামলায় ইন্সপেক্টার পরিহারের পুরো তদন্তই অনুমাননির্ভর।

নরেন্দ্র আহুজা এতক্ষণ পরে থামলেন। রুমাল দিয়ে চশমা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, ইওর অনার, সরকারী পক্ষের বিজ্ঞ অভিবক্তা যে সমস্ত পয়েন্ট উপস্থিত করেছিলেন তার অসারতা, আমি সাক্ষীদের জেরা পর্যালোচনা করে যে কাউণ্টারপয়েন্ট উপস্থিত করেছি তাতে প্রমাণিত হয়েছে। আমি আরগুমেণ্ট অকারনে দীর্ঘ করে আদালতের সময় নষ্ট করতে চাই না। প্রয়োজনও নেই। সরকারী পক্ষের সাক্ষীরা জেরার মুখে পড়ে নিজেদের মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে, প্রমাণিত করে দিয়েছে, প্রকৃত অপরাধী আর যেই হোক, অভিযুক্তা ঋতু মাথুর নয়। পরিস্থিতিগত যে প্রমাণের কথা সরকারীপক্ষ বলেছিলেন, তার ছিটেফোঁটা অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি কোন স্থূল প্রমাণও

অভিযুক্তার বিরুদ্ধে উপস্থিত করা গেল না। আমার বিজ্ঞ বন্ধু বলেছেন, অভিযুক্তার কলকাতায় ওষুধের দোকান আছে। তাঁর পক্ষে মারকিউরিক ক্লোরাইড সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। ঠিক কথা। তাহলে ত্রিকোণ প্রেমের ফরমুলাটা টিঁকছে না। কলকাতা থেকে মারকিউরিক ক্লোরাইড নিয়ে আসবার সময় অভিযুক্তার মোটেই জানা ছিল না, ফেরার পথে দৈবাৎ এয়ারপোর্টে কুশল ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যাবে। ইওর অনার, ছেলেমানুষী কাণ্ডকারখানার ওপর নির্ভর করে এই নড়বড়ে মামলাকে খাড়া করে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। এর পর আছে পুলিস পক্ষের ব্যর্থতা। এই মামলার আই. ও. যেরকম গাছাড়াভাবে তদন্ত করেছেন তার নজীর পাওয়া দুষ্কর। এই ধরনের পুলিস অধিকারী যে কোন দেশের পক্ষে বোঝাস্বরূপ। উনি জনকয়েক মিথ্যাবাদীকে আদালতে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু নিজের অপদার্থতাই প্রমাণ করেননি, এই সঙ্গে একজন অভিজাত মহিলাকে অপমানিত করার গগনলেহী স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছেন। আমার আদালতের কাছে প্রশ্ন, এই দুঃসাহসের অধিকার ইন্সপেক্টার পরিহার কোথা থেকে পেলেন? এই মামলার যে একটা বিকল্প দিকও থাকতে পারে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। খাকি উর্দিপরা ঐ ব্যক্তি যেদিকে দৃষ্টি দিলে আজ মাননীয়া ঋতু মাথুরকে অভিযুক্তার কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হত না।

ইওর অনার, আমার জেরার মুখে একের পর এক সাক্ষী যেভাবে ভেঙে পড়েছে, যেভাবে নিজেদের মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে ফেলেছে, তাতে বেনিফিট অফ ডাউটের সমস্ত রকম সুবিধা পাবার একমাত্র অধিকারিনী অভিযুক্তা ঋতু মাথুর। সুতরাং আদালতের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, অভিযুক্তাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে ন্যায়হিতকে রক্ষা করা হোক।

নরেন্দ্র আহুজা আসন গ্রহণ করলেন।

রুদ্ধবাক আদালতগৃহ এতক্ষণ পরে যেন সহজ হবার অবকাশ পেল। অনেকে প্রশংসার দৃষ্টিতে আহুজার দিকে তাকাতে লাগলেন। বিচারপতি অবশ্য বিশেষ সময় নিলেন না পর্যায়ক্রমে এই মামলার দুই অভিবক্তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জানিয়ে দিলেন আগামী ৫ই জুলাই তিনি নিজের রায় জানিয়ে দেবেন।

আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। ঋতুর মন বা মুখের অবস্থা ভাল নয়। অনেক আশার কথা ওকে শোনানো হয়েছে, তবু ভয়ের বেড়াজাল তাকে ঘিরে রয়েছে। কুশল জানে কিছুই হবার নয়। সাক্ষীদের মিথ্যা ধরা পড়ে যাওয়ার পর

এই মামলার দফারফা হয়ে গেছে। তবু অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।

এগারটার সময় বিচারপতি আসন গ্রহণ করলেন।

লাঞ্চের পর রায় হবে এই রকম ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতি এই চমকপ্রদ এবং বহুল প্রচারিত মামলার পরিসমাপ্তি প্রথমেই ঘটাতে চাইলেন। ডাক পাবার পর, হয়তো শেষ বারের মত ঋতু কাঠগডায় গিয়ে দাঁডাল। নিস্তব্ধ আদালত গৃহের ঔৎসুক্য তখন চরমে।

অনুষ্ঠানিক উপচারের পর বিচারপতি তেষট্টি পাতায় ছডিয়ে থাকা রায় গম্ভীর গলায় পডতে আরম্ভ করলেন। এই কেস যে ঠিক মত সাজানো যায়নি সাক্ষীরা যে কেউ নির্ভরযোগ্য নয়, অভিযুক্তার বিরুদ্ধে মোটিভ প্রতিপন্ন নয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করার পর—পুলিসের অকর্মণ্যতা, আদালতে কেস সাজিযে পাঠাবার নামে ছেলে-খেলা করাব বিরুদ্ধে উনি গভীর ক্ষোভ এবং উষ্মা প্রকাশ করলেন এই পুলিস কর্মচারী কেন শাস্তিযোগ্য নয় সে প্রশ্ন তুললেন। এবং বললেন, আদালতের মর্যাদা এবং ন্যায়হিতের দিকে দৃষ্টি রেখে, পুলিস পক্ষকে আরো কর্মতৎপর ও কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। পরিশেষে ঋতু মাথুরের মুক্তির আদেশ দেওয়া হল। এবং বিচাপতি উল্লেখ করতে ভুললেন না, অভিজাত ঘরের এই মহিলাকে মিথ্যা মামলায় জডিয়ে অস্বস্তি ও আতান্তরের শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

রায় শেষ করেই বিচারপতি উঠে গেলেন।

খুশীর স্রোত বয়ে গেল। মনে হল, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই এই মহিলার মুক্তি চাইছিলেন। ভীড ঠেলে কুশল এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। নরেন্দ্র আহুজা ঋতুর কাছে প্রথমে পৌছলেন। তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই ঋতু কান্নায় ভেঙে পড়ল। আবরুদ্ধ আবেগ এখন সমস্ত কিছুকে তচনচ করে লাভার স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে।

তদন্ত

পাম অ্যাভিনিউ-এর ফ্ল্যাট ছোট বলতে, খুব ছোট নয়। তিনটে ঘর ছাডা অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধে আছে। তবে ঋতুর প্রাক্তন স্বামীর সূত্রে পাওয়া বাড়ির কাছে কিছুই নয়। ঋতু জানে হাজার বার অনুরোধ করলেও কুশল সে বাডিতে যাবে না। বিয়ের পর তাই সে পাম অ্যাভিনিউ-এর ফ্ল্যাটেই চলে এসেছিল।

রায় বেরুবার পর পাটনাতে ওরা একদিনও অপেক্ষা করেনি। ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে এসেছে। দুজনেই উচ্ছ্বসিত। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার আর কোন বাধা রইল না। ইচ্ছে ছিল কোন হিল স্টেশনে গিয়ে

দিন পনেরো কাটিয়ে আসে। কিন্তু লুনার কথা ভেবে সে ইচ্ছাকে ওরা বাস্তবায়িত করেনি। লুনাকে কথা দেওয়া আছে উইণ্টারভেকেশনে সাউথ ইণ্ডিয়া বেড়াতে যাবে সকলে।

কুশলের নেওয়া ছুটির কয়েকটা দিন হাতে ছিল। কলকাতায় ফিরে ছুটি নাকচ করে দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছে। ঋতু অবশ্য অন্য কথা বলেছিল। বলেছিল বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই। কুশল নিজের মর্যাদাবোধ ছোট করতে চায় না, তাই রাজি হয়নি।

ঋতু বলেছিল, তুমি অফিসে চলে গেলে আমি একলা হয়ে পড়বো। লম্বা দুপুর আমার কাছে বিরাট বোঝার মত হয়ে পড়বে।

কুশল হেসে উত্তর দিয়েছিল, পাঁচদিন ছুটি আমার হাতে আছে। শেষ হলে তো অফিস যেতেই হত। বোঝার মত দুপুরকে ঘাড়ে চাপাতে না দিয়ে, বরং ঐ সময় নিজের কাজকর্ম দেখো।

—তার চেয়ে তুমিই আমার কাজ কর্ম দেখো। দশটা-পাঁচটার অফিস তো নয়। আমরা সব সময় কাছাকাছিই থাকবো।

—আর আমার অফিস—

ঋতু দু হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি অফিস যাবে না। তোমার চাকরির দরকার নেই।

—তা হয় না মাইডিয়ার।

—আমি বলছি বেঞ্জ—

—তুমি তো আমায় চেনো। এমন কথা কেন বলছো? আমি তোমায় গভীর ভাবে ভালবাসি তোমার অজানা নয়, তবু ভালবাসার বিনিময়ে আমি নিজের মর্যাদাবোধ বিকিয়ে দিতে পারি না।

—আমি তোমার স্ত্রী। আমিও তোমায় গভীর ভাবে ভালবাসি বেঞ্জ। আমার যা কিছু সবই তো তোমার।

—ঠিকই বলছো। তবু একটা খোঁচ রয়ে যাচ্ছে।

ঋতু ওর কাছ থেকে সরে এসে বলেছিল, আমি তোমাকে কোন উপহার দিতে পারি?

—নিশ্চয় পারো।

—আমার যা কিছু আছে সবই তোমাকে আমি দিলাম। আর আপত্তি করা চলবে না। তুমি বলেছো, তোমাকে উপহার দেবার অধিকার আমার আছে।

কুশল হেসে ফেলেছিল।

—আসামীর কাঠগড়ায় দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে তোমার একটা উপকার হয়েছে। কথার মারপ্যাচ ভালই আয়ত্ত করেছো। এখন আমায় চাকরি করতে দাও মাইডিয়ার। জীবন পড়ে আছে। পরে দেখা যাবে।

ও প্রসঙ্গে আর কথা হয়নি।

কুশল অফিস যাতায়াত করছে।

সেদিন রবিবার।

চায়ের কাপ সামনে রেখে তুজনের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ ঋতু বলল, লুনাকে পৌছে ফেরার পথে, নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসে আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ছিলাম তোমার মনে আছে?

—কোন বিষয়?

—ভীষণ ভুলো মন তোমার। লোকেশ ট্যাণ্ডনকে কে খুন করলো তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়নি?

—মনে পড়েছে। হয়েছিল।

—হত্যাকারীকে না জানা পর্যন্ত আমি দোষমুক্ত হতে পারছি না।

বিস্ময়ের সুরে কুশল বলল, আদালত থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছো। আবার কেউ তোমাকে দোষী ভাববে কেন?

—আমার ও-তরফের আত্মীয়স্বজনেরা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে, নামকরা উকিলের বাহাতুরীতে আমি ছাড়া পেয়ে গেছি। আসলে খুন আমি আর তুমি মিলে করেছি।

—ভাবলে আমাদের কোন ক্ষতি নেই।

—তা নেই। তবে এর একটা নৈতিক দিক আছে। তাছাড়া কাজটা করলে কে তা জানার একটা আগ্রহ রয়েছে। বেঞ্চ—

—বলো?

—এমন কোন ব্যবস্থা করা যায় না, যাতে হত্যাকারীকে সকলে চিনতে পারে?

—ব্যক্তিগত ভাবে আমি বা তুমি হাজার চেষ্টা করলেও লোকেশের হত্যাকারীকে পয়েন্ট করতে পারবো না। পুলিসের গা ঘামাবার যে চেষ্টা ছিল না তা আমরা দেখেছি।

—কোন উপায় নেই বলছো?

—একটা কাজ অবশ্য আমরা করতে পারি। ভদ্রলোকের ভারী নামডাক। শুনেছি কোন তদন্তে উনি অসফল হননি।

—কার কথা বলছো?

—বাসব ব্যানার্জী। প্রয়োজন হলে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও ওঁর সহযোগিতা চাওয়া হয়।

—তুমি চেনো তাঁকে ?

—চিনি না। পরিচয় না থাকলেও চলবে। আমরা তো ক্লায়েন্ট হিসাবে ওঁর কাছে যাবো। তোমার মত কি ?

—কে খুন করেছে জানা বিশেষ দরকার। ওঁর সঙ্গেই কথা বলা যাক।

—বেশ। টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা নিয়ে এসো। মিঃ ব্যানার্জীর ঠিকানা ওতেই পাওয়া যাবে।

ঋতু উঠে গেল।

দুশো একচল্লিশের কে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তখন আলস্যের আমেজ। বাসব দিন দুয়েক আগে ইন্দোর থেকে ফিরেছে। শিল্পপতি মগনলাল চৌহানের বাড়িতে পার্টি চলাকালীন একজন খুন হয়ে গিয়েছিল। সকলের চোখ বাঁচিয়ে খুন কি ভাবে হল। এবং কে করল—এই দুই বড় প্রশ্নের উত্তর পুলিস খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত চৌহানসাহাব বাসবের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

তদন্তের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে ফিরেছে। বাসব এখন সোফায় আধশোয়া অবস্থায় বসে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। শৈবাল সেণ্টার টপের উপর·তাস পেতে পেসেন্স খেলছে। কাজ থাকায় ইন্দোরের তদন্তে সে যেতে পারেনি। শুনেছে বাসবের মুখ থেকে ঘটানাটা।

পত্রিকা একপাশে রেখে বাসব বলল, আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা দেবে ?

শৈবাল একবার ওর দিকে তাকাল, তারপর তাস গুটোতে গুটোতে বলল, তুমি চুপচাপ রয়েছো আর তো কিছু করার নেই। এই ফাঁকে নিজের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবার চেষ্টা করছিলাম।

—সাধে কি আর চুপ করে ছিলাম। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

—শরীরেব দোষ কি বল না ? ধকলকে সঙ্গী করেই তো রয়েছো। আমার সাজেসান হল, বিয়ে করে ফেল।

বাসব পাইপ ধরাবার উপক্রম করছিল।

জলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি অ্যাসট্রেতে ফেলে দিয়ে, বিস্ময়ের স্বরে বললো, বলছো.কি ? বিয়ে করে ফেলবো ?

—একজন অভিজ্ঞ স্বামী হিসাবেই বলছি। যতই ধকল যাক না কেন—পত্নীর সেবা সে এক আলাদা বস্তু। আমাদের মেডিক্যাল সায়েন্সেও এত জোরাল

টনিক নেই।

—বুঝলাম। আমার মত পোড় খাওয়া বয়স্ককে কে বিয়ে করবে? তুমিই বল না, কোন বাপ এগিয়ে আসবে মেয়ে দিতে?

মুখ হাসি টেনে শৈবাল বলল, দিনদুনি ' ' হালচাল সম্পর্কে যদি কেউ অজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে আর কি বলার থাকতে পারে? কবরের মধ্যে যে এক পা দিয়ে রেখেছে তার জন্যও পাত্রীর অভাব হয় না এদেশে!

—তুমি বলতে চাইছো, সে তুলনায় এখনও আমার বাজা' দর ভালই?

—নিশ্চয়। মেয়ে দেখবো, বলো—?

বাসব মৃদু হেসে বলল, নিগোশিয়েসন ম্যারেজের চেযে, কাউকে যোগাড় করে নিয়ে বিয়ে করাটা বোধহয় বেশী ভাল হবে।

—এ তো মাছ ধরা নয়। ছিপ ফেলে বসে থাকবে, আব একজন মহিলা টোপ গিলবেন? তার চেয়ে বর্তমান ধকলের অবসাদ কাটাবার জন্য কোন হিল স্টেশনে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নাও। তারপর—

—বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? একটা কেস বোধহয় হাতে এসে পড়লো।

—কি রকম?

—ঘটনাটা পাটনার। ফোনে কথা হয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় ক্লায়েণ্টের আসার কথা।

—সাড়ে সাতট তো প্রায় বাজে। কেসটা কি?

—বিস্তারিত ভাবে কিছু জানি না। ব্যাপারটা খুনের।

এই সময় বাহাদুরের দেখা পাওয়া গেল।

এক জোড়া মহিলা ও পুরুষ দেখা করতে এসেছেন শুনেই বাসব তাঁদের এখানে নিয়ে আসতে বলল। মিনিট দুয়েক পরেই ঋতু আর কুশল ওদের সামনে এসে বসল। প্রাথমিক পরিচয় ও শিষ্টাচার বিনিময় হল।

কুশল বলল, আমার স্ত্রী একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আদালতে বড় মাপের মামলা হল। ভাগ্যক্রমে উনি মুক্তি পেয়েছেন। তবে—

—আপনারা এই ব্যাপারের শেষটা দেখতে চান?

—ঠিক তাই। কে খুন করে আমার স্ত্রীকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছিল, তার স্বরূপ আমরা দেখতে চাই মিঃ ব্যানার্জী।

—আমাকে সব কথা খুলে বলুন। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দেবেন না। তারপর আমি স্থির করবো, এই কেস আমি নেব কি নেব না।

পালা করে ঋতু আর কুশল সমস্ত কিছু বলে গেল।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়াতে একাগ্র মনে সমস্ত কিছু শুনলো। শৈবালও শুনে গেল তাসের প্যাকেট নাডাচাড়া করতে করতে। ওরা এলাহাবাদের প্রসঙ্গ থেকে আরম্ভ করে, আদালত থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কথাই বলে গেছে। বলা শেষ হবার পরও বাসব মিনিট দুয়েক কিছুই বলল না। অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইল ম্যান্টেলপিস-এর উপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে।

শেষে—

—ব্যাপারটার মধ্যে নতুনত্ব আছে। মিঃ ব্যানার্জী, আপনারা বিয়ে করার ব্যাপারে এত ব্যস্ততা দেখিয়েছিলেন কেন ?

কুশল বলল, ভয় হচ্ছিল আবার না আমাদের ছাডাছাডি হয়ে যায়। এছাড়া ঋতুর নিরাপত্তার কথাটাও ভাবতে হচ্ছিল।

বাসব বলল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। কেসটা আমি নিলাম। এবার আপনাদের কিছু করণীয় রয়েছে।

ঋতু বলল, ধন্যবাদ। বলুন, কি করতে হবে ?

—তার আগে লালবাজারের সঙ্গে একবার কথা বলে নিচ্ছি। ডাক্তার, বাহাদুর কোথায় গেল দেখো তো। কফির ব্যবস্থা হোক।

কথা শেষ করেই বাসব টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের দিকে এগুলো। রিসিভার তুলে নিয়ে, ডায়েল করতে আরম্ভ করল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, লাইন পেতে কোন অসুবিধা হল না। হোমিসাইডের বড কর্তা পুরন্দর সামন্তর সঙ্গে যোগাযোগ হল।

সামন্ত : কবে ফিরলেন মশাই ইন্দোর থেকে ?

বাসব : দিন কয়েক হল। আবার একটা কেস হাতে এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ জটিল।

সামন্ত : আপনি ভাগ্যবান লোক। মক্কেলরা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু। গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে, অথচ এখনও আমরা জানতে পারিনি—এর মানেটা কি ?

বাসব : ঘটনাটা বিহারের। মক্কেলরা কলকাতার। আপনাকে বলবো সব কথা পরে। এখন বলুন তো, পাটনার সিটি এস. পি. কে ?

সামন্ত : খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। তবে কাজের সুবিধার জন্য যদি এই এনকয়ারি হয় তবে বলবো, এর চেয়েও বড় মাপের কর্তা তো আপনার মুঠোর মধ্যে।

বাসব : কার কথা বলছেন ?

সামন্ত—কুলদীপ মেহরা। উনি তো এখন ওখানকার ডি. আই. জি. ক্রাইম।

বাসব—তাই নাকি! ধন্যবাদ। কাল কোন সময় আসছি। তখন সব কথা হবে।

লাইন কেটে দিয়ে বাসব আবার সোফায় ফিরে এল। কফিও এসে পড়েছে। সকলে পেয়ালা তুলে নিল।

শৈবাল বলল, মিঃ সামন্ত কোন ভাল কথা শুনিয়েছেন মনে হচ্ছে?

বাসব বলল, আমাদের মেহরা সাহাব এখন ওখানকার ডি. আই. জি. ক্রাইম। কাজের অনেক সুবিধা হবে।

কুশলের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, কোর্টে সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছিল। তার কপি আনার দরকার হবে।

কুশল বলল, সার্টিফায়েড কপি নেওয়া হয়েছিল। আমাদের কাছে নেই। ফাইল মিঃ আহুজার কাছে রয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। মিঃ আহুজার কাছ থেকে ফাইল নিয়ে নেওয়া যাবে। আজ সোমবার, আমরা বুধবারে পাটনা রওয়ানা হচ্ছি। রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা রাখবেন।

—আপনাদের কোন অসুবিধা হতে দেব না। আপনার সম্মান মূল্য কত জানা নেই। আগাম হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাইছিলাম।

—কাজটাই হল আসত কথা। পেমেণ্টের ব্যাপারটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম। নিজেদের সুবিধামত যা স্থির করবেন তাই মেনে নেবো।

পাঁচ হাজার টাকার চেক রেখে ঋতু ও কুশল বিদায় নিল। এতক্ষণ পরে পাইপ ধরাল বাসব। প্রাক সন্ধ্যার মোলায়েম অন্ধকার তখন ক্রমেই কলকাতার উপর ঘন হয়ে আসছে। প্রতিবারের মতো শৈবাল সেই বিশেষ প্রশ্নটা করল।

—কি বুঝলে?

বাসব পাইপ মুখ থেকে খসিয়ে এনে বলল, হত্যাকারী কে তা এখন আমার চিন্তার বিষয় নয় ডাক্তার। খুন করার পদ্ধতিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

—কেন? মারকিউরিক ক্লোরাইড ভিক্টিমকে খাওয়ানো হয়েছিল, তা তো পোস্টমর্টমের রিপোর্টেই বলা হয়েছিল।

—কখন খাওয়ানো হয়েছিল? কিভাবে খাওয়ানো হয়েছিল? এই দুটো প্রশ্নের উত্তরের উপর এই কেসের অনেক কিছু নির্ভর করছে। তুমি বল তো মারকিউরিক ক্লোরাইডের অ্যাকশন কিভাবে হয়?

শৈবাল বলল, অল্প মাত্রায় যদি পেটে যায় তবে তার প্রভাব দেরিতে পড়বে। আর জলদি কাজ চাইলে মাত্রা বেশী হওয়া দরকার।

—তাহলে কি দাঁড়াল ?

—সম্ভাবনা দুদিক থেকেই আছে। হত্যাকারী অনেক আগেই অল্প মাত্রায় মারকিউরিক ক্লোরাইড ভিক্টিমকে খাইয়েছিল কোন পানীয়ের সাহায্যে। মৃত্যু যখন হোক, যেখানে হোক আসুক। কিংবা সে বেশী মাত্রায় ব্যবহার করেছিল যাতে দুশো দশ নম্বর ঘরেই ওর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ঋতু মাথুরকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র।

—তোমার বিশ্লেষণ খারাপ নয় ডাক্তার। তবে প্রশ্নগুলো যে যার জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন, রাত সাড়ে দশটার সময় লোকেশ ট্যাণ্ডন ঋতু মাথুরের ঘরে কেন গিয়েছিল ? সেক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে উপচারিক আলাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোন মহিলার ঘরে অসময় কোন পুরুষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে যেতে পারে না। দ্বিতীয় কথা, যে কোন কারণেই হোক লোকেশ সেখানে গিয়েছিল। সে যখন দেখলো ঋতু মাথুর ঘরে নেই তখন সে অপেক্ষা করছিল কেন ?

—এমন হতে পারে, সে অপেক্ষা করেনি। ঘরে ঢোকার পরই মারা পড়েছিল।

—তুমি বলতে চাইছো, তাকে যে অল্প মাত্রায় মারকিউরিক ক্লোরাইড খাওয়ানো হয়েছিল তার অন্তিম লগ্ন তখন ছিল ?

—আমার তো তাই ধারণা।

—মৃতদেহ তবে বাথরুমে গেল কিভাবে ! ভুলে গেলে চলবে না, পুলিস বলেছে, বডি বেডরুম থেকে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ ওরা বডি টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন পেয়েছিল। এর একটাই অর্থ হয় ডাক্তার, লোকেশ যখন মারা যায় তখন ঘরে আর একজন লোক ছিল।

—কে হতে পারে সেই লোক ?

—বাইরের কেউ নিশ্চয় নয়। ঋতু মাথুরকে বিপদে ফেললে যাদের সুবিধা হয়, তাদেরই মধ্যে কেউ একজন এ কাজ করেছে।

—তার মানে ত্রিকোণ প্রেমট্রেম পুলিসের ধারণা, আসল ব্যাপারটা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট।

—একজ্যাক্টলি। সেই স্বার্থতাড়িতের কথা আমরা পরে ভাববো। বর্তমানে আমার আগ্রহ অন্যত্র—

—কিরকম ?

—আমি রামনরেশের কথা ভাবছি।

—সে আবার কে ?

পাইপ নিভে গিয়েছিল অনেক আগেই।

বাসব ধরিয়ে নিয়ে বলল, হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারার কথা বলছি।

সে সেদিন নাইট ডিউটিতে ছিল না। হোটেলেই ছিল না রাত্রে। অথচ আদালতে সে বলেছে, গভীর রাতে ঋতু মাথুরকে এঘর থেকে ওঘরে যেতে দেখেছে!

—পরে জেরার মুখে বলেছে, সে কিছুই দেখেনি। সে আদপেই ডিউটিতে ছিল না।

—কথাটা আমার মনে আছে। কিন্তু পুলিসকে আগে এবং আদালতে সরকারী পক্ষের প্রশ্নের উত্তরে সে কেন মিথ্যা কথা বলেছিল?

—সাক্ষীরা এই ধরনের মিথ্যা কথা বলেই থাকে।

—যরা সাক্ষী দিতে এসে মিথ্যা কথা বলে, কোন একটা স্বার্থের দিকে তাকিয়েই বলে। একজন হোটেল বেয়ারার এই হত্যাপ্রকরণে কি স্বার্থ থাকতে পারে?

শৈবাল চুপ করে রইল।

বাসব আবার বলল, ঋতু মাথুরকে বিপদে ফেলে তার কি লাভ? তবু সে মিথ্যা কথা বলেছে। এর একটা কারণ নিশ্চয় আছে ডাক্তার। অকারণে ঐরকম গুরু-গম্ভীর পরিবেশে কেউ মিথ্যা কথা বলে না। বিশেষে রামনরেশের মত একজন সাধারণ বেয়ারা।

—তার মানে ওর অন্য ধরনের কোন স্বার্থ ছিল।

—ঠিক ধরেছো। এখন আমাদের দেখতে হবে কি ধরনের স্বার্থ তার থাকতে পারে।

—স্বার্থ অর্থঘটিত হতে পারে। কেউ হয়তো মোটা টাকা দিয়ে তাকে ঐ ধরনের কথা বলতে বলেছিল।

—চমৎকার। আজকাল লক্ষ্য করছি তোমার মাথা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নিশ্চিতভাবে কেউ টাকা দিয়েছিল। রামনরেশের মত সাধারণ লোক লোভ সামলাতে পারেনি।

—রহস্যের উপর থেকে পর্দা তো উঠে গেল বলতে গেলে।

—কিভাবে?

—মেহরা সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকবেন। রামনরেশের পেট থেকে আসল কথা বার করতে অসুবিধা হবে না। কালপ্রিটের নাম আমরা এইভাবে জেনে যেতে পারবো।

—একদিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছো। আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। ব্যাপারটা কি এতই জলবৎ তরলং। রামনরেশের মত সাধারণ লোকের উপর নির্ভর

করে এমন কাঁচা কাজ কি কালপ্রিট করতে পারে ?

—তুমি বলতে চাইছো, নিজে আড়ালে থেকে অন্য কোন কায়দায় রামনরেশকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল ?

—এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

—সেই কায়দাটা কি ?

—মাঠে নামার পর আঁচ পাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা ডাক্তার, পুলিসের কার্যকলাপে কোন অসঙ্গতি তুমি দেখতে পাচ্ছ ?

—ঋতু মাথুরকে ওরা যখন দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তখন কুশল ব্যানার্জীকেও উচিত ছিল গ্রেপ্তার করা। একা কোন মহিলার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হল না।

—নিশ্চিতভাবে আনা উচিত ছিল। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মত, হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে স্বচ্ছন্দে জেনে নেওয়া যেত, রামনরেশের সেদিন রাত্রে ডিউটি ছিল কিনা। তাহলে তার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যেত। রামনরেশ গুরুত্বহীন সাক্ষী হয়ে পড়তো। পুলিসের এই গাছাড়া ভাবের কারণ কি ? অথচ অভিযুক্তা পক্ষের উকিল রামনরেশকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন সে মিথ্যা কথা বলেছে।

. শৈবাল বলল, আসল কথা হল, পুলিস প্রথমেই ঋতু মাথুর সম্পর্কে মাইণ্ড মেকাপ করে নিয়েছিল। তাই গভীর ভাবে তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তাবোধ করেনি।

—হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

—অর্থাৎ—

—কাগজপত্র আগে দেখেনি, তারপর আমিও মাইণ্ড মেকাপ করবো। ডাক্তার, আরেকবার কফি হলে কেমন হয় ? দেখ তো, বাহাদুর কি করছে ?

কথা শেষ করেই বাসব ক্লান্ত ভাবে হাই তুলল।

ঘণ্টা কয়েক হল বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পাটনায় এসেছে। প্লেনে কলকাতা থেকে এখানে আসতে কতক্ষণই বা সময় লাগে। ঋতু, কুশল এবং ব্রজবাবুও আছেন সঙ্গে। বাসবের ইচ্ছানুসারে এয়ারলাইন্স হোটেলেই ঘর নেওয়া হয়েছে। টেলিফোনে ঋতুর সঙ্গে কথা হয়েছে নরেন্দ্র আহুজার। ব্রজবাবু গেছেন ওঁর কাছ থেকে ফাইলটা নিয়ে আসতে। দুপুরের খাওয়া শেষ হবার পর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম না নিয়ে বাসব হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গে শৈবাল আছে। গাড়ির ব্যবস্থা করাই ছিল। কয়েকবার এলেও পাটনা

শহরের ভূগোল ওদের তেমন সড়গড় নয়। গন্তব্যস্থলের কথা ড্রাইভারকে জানাতে সে বেচারাও চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবে বিবেচনার পরিচয় দিয়ে ঐ অঞ্চলের থানায় গিয়ে উপস্থিত হল।

ওখান থেকেই জানা গেল ডি. আই. জি. অফিসের ঠিকানা। কলকাতার মত বিশাল ট্র্যাফিক নেই—মারাত্মক জ্যাম নেই, কাজেই মিনিট কুড়িকের মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌছনো গেল। ভাগ্যক্রমে মেহরা সাহাব অফিসেই ছিলেন। বাসবের কার্ড হাতে পেতেই নিজে বেরিয়ে এলেন। শোরগোল তুলে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওদের নিয়ে গিয়ে বসালেন নিজের অফিস রুমে।

—কবে এসেছেন ? খবর করলেন আমাকে, আমি গিয়ে দেখা করতাম।

বাসব মৃদু হেসে বলল, ঘণ্টা কয়েক হল এসেছি। পদমর্যাদা বেড়ে যাওয়ায় আপনার ব্যস্ততাও বেড়েছে। আপনাকে তাই আরো ব্যস্ত করে তুলতে চাইনি। নিজেরাই চলে এলাম।

মেহরা বললেন, পুলিসের চাকরিতে যেমন ব্যস্ততা আছে, তেমনই ফাঁকিবাজীও আছে। কেসটা কি বলুন তো ? সম্প্রতি রহস্যময় কিছু পাটনায় ঘটেছে বলে তো আমার জানা নেই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, ঘটনাটা কিঞ্চিৎ পুরনো। কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। অভিযুক্তা খালাস পেয়েছেন। তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

—অভিযুক্তা—

—ঋতু মাথুর।

মেহরা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—বুঝলাম, পুলিসের আরেক অকর্মণ্যতার দায় আপনার উপর পড়েছে। ব্যাপারটা খুলে বলুন তো!

বাসবের সাজানো ছিল। বলল।

শোনার পর মেহরা বললেন, মহিলার উপর দিয়ে ভাল রকম ধকল গেছে। থানার ঐ-ইডিয়েটগুলো ইনভেস্টিগেশন কোন পাখীর নাম একেবারেই জানে না।

—আপনার সহযোগিতা কিন্তু আমার চাই।

—ও কথা বলে আমাকে লজ্জিত করবেন না মিঃ ব্যানার্জী। যে কোন সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য আমি প্রস্তুত আছি জানবেন। এবার উঠুন আপনারা।

—কোথাও যেতে হবে ?

—বাংলোয় চলুন। মিসেস মেহরা আপনাদের দেখে ভারী খুশী হবেন। কাজ-

টাজ যা আছে, কিছু পরে আরম্ভ করলেও চলবে।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, নাথ কথার এক কথা। মিসেস মেহরার শান্তীক চেহারা অনেকদিন দেখা হয়নি। চলুন, যাওয়া যাক।

বেলা পড়ে এসেছে।

ব্রজবাবু কিছুক্ষণ আগে ফাইল পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

বাসব মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছে পাতার পর পাতা। ভাগ্যক্রমে ইংরাজীতেই ফাইল তৈরী করা হয়েছিল। যদিও সাক্ষীদের বয়ান সমস্ত হিন্দীতেই হয়েছিল। তার সার্টিফায়েড কপিও রয়েছে। তবে ইংরাজী অনুবাদও রাখা হয়েছে। এর কারণ নরেন্দ্র আহুজা হিন্দীভাষী নন। কাজের সুবিধার জন্যই এরকম করতে হয়েছে।

পৌনে ছটার সময় বাসবের পড়া শেষ হল। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল গাছপালা ঘেরা একটা জায়গার দিকে। মনের মধ্যে চিন্তা ভুজঙ্গায়ত গতিতে ঘোরা ফেরা করছে।

একটা প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই পেলে ভাল হয়। লোকেশ ট্যাণ্ডনকে কি ভাবে খাওয়ানো হয়েছিল মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো পানীয়? বাসব চিন্তার বোঝা ঘাড়ে নিয়েই ফিরে এল আবার নিজের জায়গায়। পাইপ ধরাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল এতক্ষণ পরে।

শৈবাল স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পড়ছিল।

মুখ তুলে বলল, ফাইল ঘেঁটে কিছু পেলে?

—অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়ল।

—কি ভাবে এগুবে স্থির করেছো?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এই কেসের তদন্তকারী ইন্সপেক্টারের সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে চাই। তদন্তের ব্যাপারে এমন গাছাড়া ভাব কেন তা জানা বিশেষভাবে দরকার। মিঃ মেহরা এসে পড়লেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু ডাক্তার, একটা প্রশ্নের উত্তর তো একেবারেই খুঁজে পাচ্ছি না।

—কোন্ প্রশ্নের?

—তোমার সঙ্গে আগেও ও-বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। মারকিউরিক ক্লোরাইড লোকেশ ট্যাণ্ডনের পেটে গেল কি ভাবে?

—সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছিল।

—তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল। সরবত খাবার সিজিন নয়। তাছাড়া অসময়ে

অর্থাৎ রাত সাড়ে দশটার পর কেউ সরবত খেতে চাইবে না।

—চা খেতে পারে নিশ্চয়ই ?

—তা পারে। তবে গরম কিছুর সঙ্গে মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশালে কি কার্যকর হবে—আমার জানা নেই। তুমি কি বল ?

—এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। আমারও কোন জ্ঞান নেই। বিয়ার হুইস্কি বা ঐ জাতীয় কিছুর সঙ্গে কি খাওয়ানো যেতে পারে না ?

বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, একজ্যাক্টলি। এটাই বোধ হয় সঠিক সম্ভাবনা। নেশার ব্যাপারটা যে কোন সিজিনে, যে কোন সময় চলতে পারে। তবে মদের বোতল নিয়ে ঋতু মাথুরের ঘরে লোকেশের যাওয়া কি সম্ভব, এবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের।

মদের বোতল নিয়ে সে কখনই ঐ অসময়ে মহিলার ঘরে যেতে পারে না।

ঠিক বলেছ। তাহলে দাঁড়াল কি ? ২১৬ নং ঘরে যাবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই লোকেশ মদ খেয়েছিল। তাতে মেশানো ছিল মারকিউরিক ক্লোরাইড। ঋতু মাথুরের দুর্ভাগ্য লোকেশের অন্তিমক্ষণ এসে উপস্থিত হয় তারই ঘরে।

শৈবাল বলল, তাহলে ব্যাপারটা তো মিটেই গেল। এখন দেখতে হবে কাজটা করেছে কে ?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। তবে এখনও আমার মন খুঁতখুঁত করছে। গভীর কোন প্যাঁচ থাকা বিচিত্র নয়।

বাসব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল—এই সময় বেল বেজে উঠল। শৈবাল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই মেহরা সাহার দেখা দিলেন। পুরো ইউনিফর্মে ভারী স্মার্ট দেখাচ্ছে তাঁকে এখন।

মুখে হাসি টেনে বললেন, নিশ্চয় দেরি করে ফেলিনি। আমাদের এখন প্রথম কাজটা কি ? ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা ?

বাসব বলল, থানা-ইনচার্জের সঙ্গে প্রথমে কথা বলে নিলে ভাল হয়।

—বেশ তো অসুবিধা না থাকলে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

মেহরা সাহাবের গাড়িতেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনজন সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে পৌঁছল এখানকার যা রেওয়াজ। পরিহার নিজের অফিসে ছিলেন না। কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ডি. আই. জি. এসেছেন সংবাদ পেয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন। দুজন নবাগতর সঙ্গে এই উচ্চ পদাধিকারীকে তিনি আশা করেননি।

স্যালুট মেরে উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়ালেন।

মেহরা সাহাব বললেন, গত জানুয়ারী মাসে এয়ারলাইন্স হোটেলে যে মার্ডার

হয়েছিল, তার তদন্ত আপনি করেছিলেন ?

বিনীত ভাবে পরিহার বললেন, হ্যাঁ, স্যার।

—বর্তমানে কেসের অবস্থা কি ?

—রায় হয়ে গেছে স্যার। আসামী খালাস পেয়েছে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আদালতের উপর আজকাল নির্ভর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

মেহরা সাহাব গলা তুললেন, বাজে কথা বলবেন না। আমি কেসটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েই এসেছি। তদন্তের নামে আপনি ছেলেখেলা করেছেন। আপনাদের মত লোকই পুলিস ডিপার্টমেন্টের বদনাম করে রেখেছে। রায়ের নকল আপনি পেয়েছেন ?

—পেয়েছি স্যার।

—আপনার অকর্মণ্যতার সার্টিফিকেট আপনি দেখেছেন। আসল খুনী কে তার তদন্ত আরম্ভ করেছেন কি ? না, আবার ফাইল খোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি ?

—এখনও স্যার—মানে—

—আপনাকে কেন সাসপেণ্ড করা হবে না বলুন তো ?

পরিহার ঘামতে লাগলেন।

মেহরা সাহাব আবার বললেন, ঐ কেস বেসরকারী ভাবে তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। আমরা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। এঁরা কলকাতা থেকে ঐ ব্যাপারেই এসেছেন। ইনভেস্টিগেশন জগতের স্তম্ভস্বরূপ। সমস্ত রকম সহযোগিতা দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন জানিয়ে রাখলাম।

—হ্যাঁ স্যার। নিশ্চয়—

—মিঃ ব্যানার্জী আমি তাহলে এখন যাই। পরে দেখা হচ্ছে।

মেহরা সাহাব বিদায় নিলেন।

আগেই এই রকম স্থির হয়েছিল। মেহরা সাহাবের সামনে পরিহার কখনই সহজ হতে পারবেন না। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির খৈ পাওয়া যাবে না। তাই এই ব্যবস্থা। বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল। পরিহার কিছুটা সহজ হয়েছেন। তার সাসপেণ্ড হয়ে যাওয়ার কাঁটা গলায় বিঁধে রইল।

উনি যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বললেন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি ?

—আহামরি কিছু নয়—বাসব বলল, ঐ কেসে আপনি যে ডায়রী দাখিল করেছিলেন, তা আমি পড়েছি। সাক্ষী হিসাবে আপনি আদালতে যা কিছু বলেছেন তা আমার জানা আছে। ঐ সম্পর্কেই কিছু জানতে চাইবো।

—কি জানতে চান বলুন ?

—এয়ারলাইন্স হোটেলের সেকেণ্ড ফ্লোরের বেয়ারা মিথ্যে কথা বলছে তা আপনি সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন—হোটেলের অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টারই যথেষ্ট ছিল, অথচ—

বিরক্তির সুরে পরিহার বললেন, আমার কাজের সমালোচনা শুনতে চাই না। আপনি কি জানতে চান তাই বলুন ?

বাসব তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এই কেস-রি-ওপেন হয়েছে, এখনও বুঝতে পারেননি ? আপনার অক্ষমতার দায় অন্য কেউ নেবে না। মিঃ মেহরা কি বলে গেলেন আপনি শুনেছেন। নিজের বিপদ আর ডেকে না এনে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

পরিহার বুঝলেন বেশ বেকায়দায় পড়ছেন।

উত্তর দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন।

—রামনরেশকে যখন প্রশ্ন করছিলাম তখনই সে কথাটা বলে। পুলিসের সামনে বড় একটা কেউ এই ধরনের মিথ্যা বলে না।

—কাজেই আপনি অ্যাটেণ্ডেন্স রেজিস্টার দেখলেন না। এমন কি রামনরেশ সত্যি কথা বলেছে কিনা তা ম্যানেজারের কাছ থেকে যাচাই পর্যন্ত করে নেবার চেষ্টা করলেন না। যাহোক, এখন আপনার কি মনে হচ্ছে ?

—কি ব্যাপারে ?

—রামনরেশ অকারণে ডাহা মিথ্যা কথাটা নিশ্চয় বলেনি ?

—আপনি বলতে চাইছেন, যে কারুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে ঋতু মাথুরের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত কথা বলেছিল ?

—শুধু আমি নয়, আপনারও মত ঐ হওয়া উচিত। টাকা—রামনরেশকে কে দিতে পারে ?

—মিসেস মাথুরের শ্বশুরবাড়ির যে কেউ।

—কেন ?

—এখন মনে হচ্ছে, মিসেস মাথুর বিপদে জড়িয়ে পড়লে ওঁদের আর্থিক লাভ হবার সম্ভবনা ছিল।

—রামনরেশকে চেপে ধরলে কে তাকে টাকা দিয়েছিল জানা যেতে পারে। কি বলেন ?

পরিহার এবার কিছুটা উৎসহিত বোধ করলেন।

—ওর পেট থেকে আমি কথাটা বার করে নিতে পারবো।

মিস্টার ছাই হয়ে গিয়েছিল।

পাইপ নামিয়ে রেখে বাসব বলল, এদিকটা যাহোক হল। এবার কুশল ব্যানার্জির ব্যাপারটা আপনি আদালতে ওঁর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অথচ ওঁকে গ্রেপ্তার করেননি। কেন?

—তদন্তের সময় উনি আমার চোখে সন্দেহভাজন ছিলেন না। পরে—মানে…

—ব্যাখ্যা অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়। এখন আর কথা নয়। আমাকে একটু সাহায্য করুন। এয়ারলাইন্স হোটেলে চলুন আমাদের সঙ্গে। ম্যানেজার আর রামনরেশের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি সঙ্গে থাকলে সুবিধা হবে।

দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা হোটেলে পৌছল।

বাসব নিজেদের ঘরেই রামনরেশকে ডেকে পাঠালো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল। ইন্সপেক্টার পরিহারকে আশা করেনি। সারা মুখ ভরে উঠল ছায়ায়। আবার কোন গোলমাল হল নাকি?

পরিহার বললেন বাসবের দিকে ইঙ্গিত করে, লোকেশ ট্যাণ্ডনের ব্যাপারে ইনি এসেছেন কলকাতা থেকে। এঁর প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দেবে।

কাঁপা গলায় রামনরেশ বলল, আমার যা জানা ছিল আপনাকে বলেছি হুজুর। আদালতেও বলেছি। আর তো কিছু জানা নেই।

—তুমি মিথ্যা কথা বলেছো—বাসব বলল, তোমার মুখ থেকে আমরা আসল কথা শুনতে চাই।

—আসল কথা—বিশ্বাস করুন, আমি আর কিছুই জানি না।

—তুমি বলেছিলে, সেদিন গভীর রাত্রে ঋতু মাথুরকে ২১০ নম্বর ঘর থেকে ২১৬ নম্বর অর্থাৎ নিজের ঘরে যেতে দেখেছিলে। আবার সেই তুমি আদালতে স্বীকার করেছো কথাটা মিথ্যা। ঋতু মাথুরের উপর কোন কারণে তোমার রাগ ছিল?

—না।

—শত্রুতা ছিল?

—না।

—তবে কেন তাঁকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছিলে? কেন মিথ্যা এজাহার দিয়েছিলে? কেন মিথ্যা সাক্ষী দেবার চেষ্টা করেছিলে?

রামনরেশ ঘামতে আরম্ভ করল।

পরিহার বললেন, তোমার মিথ্যা বলার দরুন আমাকেও আদালতে ছোট হতে হয়েছে। বলো, কেন তুমি মিথ্যা কথা বলেছিলে?

—আমি অন্যায় করেছি। আমায় ক্ষমা করুন হুজুর।

—ক্ষমাটমার কথা পরে আসছে। আগে বলো, কেন তুমি মিথ্যার জাল

বুনেছিলে? চুপ করে থাকলে পার পাবে না। থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড ধোলাই দেব। আরো সব হাড়কাঁপানো ব্যবস্থা আছে তুমি বোধহয় জানো?

রামনরেশের মুখ একেবারে চুপসে গেছে।

কয়েকবার ঠোঁট চেটে নিয়ে বলল, আমি গরীব মানুষ। লোভে পড়ে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। কাজটা আমি ভাল করিনি হুজুর। লোভই আমার সর্বনাশ করে ছাড়ল।

বাসব বলল, কি রকম লোভ? কে তোমায় লোভ দেখিয়েছিল?

—আমায় টাকা দেওয়া হয়েছিল।

—কত?

—দু হাজার।

—কে দিয়েছিল?

—আমি জানি না সাব।

বাসব বিস্ময়ের সুরে বলল, তা কিভাবে সম্ভব? তুমি টাকা পেলে অথচ তোমাকে কে টাকা দিল জান না!

—আমি সত্যি কথা বলছি। কে আমাকে টাকা দিয়েছে আমি জানি না।

—বিশ্বাস না হলেও তোমার কথাই মেনে নিলাম। এখন বলো, কি ভাবে তুমি টাকাটা পেলে?

—আমি ২৩০ নম্বর ঘরে গিয়েছিলাম সাফাইয়ের কাজে। সোম সাহাব তখন বাথরুমে ছিলেন। এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল—

—দাঁড়াও। সোম সাহাব কে?

—আদিত্য সোম। ২৩০ নম্বর ঘর ওঁর নামেই বুক ছিল।

—কবেকার কথা বলছো?

—১২ই জানুয়ারী সাহাব। এর ঘণ্টাখানেক আগেই আমি আর ঋতু মেম সাহাব লোকেশবাবুর মড়া দেখতে পেয়েছিলাম।

পরিহার প্রশ্ন করলেন, আমি তখন ওখানে ছিলাম?

—হ্যাঁ, হুজুর। আপনি ঋতু মেম সাহাবের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

—তারপর কি হল?

—সোম সাহাব বাথরুমে থাকায় আমাকেই ফোন তুলতে হল। ওধারের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ফোনটা আমারই—

—তারপর কি হল?

বাসব বলল, ঠিক যে ভাবে ফোনে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, সেই ভাবে বল?

রামনরেশ একটু চুপ করে থাকার পর বলল, ওধার থেকে একজন বলছিল, বেয়ারা রামনরেশ ওখানে আছে। ওকে ডেকে দিন।

—রামনরেশ কথা বলছি। আপনি কে?

—তোমার উপকার করতে চাই। দু হাজার টাকা তোমায় দেব। আমার ছোট একটা কাজ করে দিতে হবে।

—আপনি কে কথা বলছেন সাব?

—তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই। টাকাটা চাও কিনা বলো?

—টাকাটা পেলে আমার খুবই উপকার হয়। আপনার কাজটা কি জানি না তো। আমার পক্ষে সম্ভব হলে—

—সম্ভব হবে। করিডরের কোণে যে কাবার্ড আছে, তার মধ্যে খামে ভরা টাকাটা রয়েছে। তুমি নিতে পারো।

—কাজটা কি বললেন না—

—কাল গভীর রাত্রে তুমি ঋতু মাথুরকে ২১০ নম্বর ঘর থেকে ২১৬ নম্বর ঘরে যেতে দেখেছো এই কথাই তুমি বলবে পুলিসকে।

—কাল রাত্রে তো আমার ডিউটি ছিল না।

—তাতে কিছু আসবে যাবে না। তুমি ঐ কথাটা বললেই পুলিস লুফে নেবে। আরেকটা কথা, আমার সঙ্গে চালাকি করতে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বে। লাইন কেটে গেল। কাবার্ডের মধ্যে টাকাটাও পেলাম। আমি ভেবেছিলাম ঐ কথাগুলো পুলিসকে বললে কি আর হবে। তাই—

—তুমি আর কিছু জানো যা পুলিসকে বা আদালতে বলনি?

—না, সাব। আমি আর কিছু জানি না।

রামনরেশকে বিদায় করা হল।

এবং বলে দেওয়া হল হোটেলের ম্যানেজারকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ম্যানেজার দেখা দিলেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। বুঝে উঠতে পারছিলেন না বোধহয়, আবার কি হল?

তাঁকে বসার ইঙ্গিত করে পরিহার বললেন, ঋতু মাথুর আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন শুনে থাকবেন। ঐ কেস নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে। ইনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। যা সত্যি তাই বলবেন উত্তরে।

—বলুন স্যার।

বাসব বলল, ২১৬ নম্বর ঘর ঋতু মাথুরের নামে বুক ছিল। দুর্ঘটনা ঘটার কত পর থেকে ঐ ঘরে বোর্ডার আসতে আরম্ভ করে?

—২১৬ নম্বর ঘরে বোর্ডার নেওয়া হয় না।

—কেন ?

—ঐ ঘরে খুন হয়ে যাওয়ার দরুন অশুভ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। দেখেশুনে ম্যানেজমেণ্ট বোর্ডার নিতে এখন মানা করেছেন।

—ঘরটা বন্ধ করে রাখা হয় ?

—হ্যাঁ স্যার।

—১২ই জানুয়ারী যে ভাবে ঘর সাজানো ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে ?

—তাই আছে। প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়।

—সেদিন ঘরে যা যা ছিল আজও তাই আছে ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—মিঃ ম্যানেজার, এই হোটেলের প্রতিটা ঘরেই তো টেলিফোন আছে। কোন বোর্ডার অন্য ঘরে ফোন করতে চাইলে ডায়রেক্ট করতে পারবে ?

ম্যানেজারের চিন্তিত ভাব কেটে গিয়েছিল। বললেন, ডায়রেক্ট করা যাবে না। আমাদের এক্সচেঞ্জ বোর্ড আছে। ওখানে বলতে হবে, অমুক ঘরে লাইন দিন—এক্সচেঞ্জ দেবে।

—বাইরে কাউকে ফোন করতে গেলেও নিশ্চয় এই ব্যবস্থা ?

—হ্যাঁ, স্যার।

—এর কোন রেকর্ড রাখা হয় ?

—রেকর্ড তো রাখতেই হয়।

—এর মানে এই দাঁড়াল, এ ঘর থেকে ও ঘর এবং এখান থেকে বাইরে ও বাইরে থেকে এখানে কে কাকে ফোন করছে তার একটা হিসাব আপনারা রেখে থাকেন ?

—রেজিস্টার মেণ্টেন করা হয়। অপারেটার প্রতিটা ক্ষেত্রে নোট রাখে।

বাসব পাউচ আর পাইপ সেণ্টার টপের উপর থেকে তুলে নিয়ে বলে, ভাল ব্যবস্থা। ঐ রেজিস্টারটা একবার দেখতে চাই।

—গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—পরে হলেও চলবে। এখন ২১৬ নম্বর খোলাবার ব্যবস্থা করুন। ঘুরেফিরে ঘরখানা দেখতে চাই।

—এখনই ব্যবস্থা করছি।

ম্যানেজার ব্যস্ত ভাব নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাসব পাইপ ধরাল। ঘনঘন কয়েকবার টান দেবার পর তাকাল পরিহারের দিকে। মুখে প্রসন্নতার ছাপ।

পরিহার বললেন, রামনরেশকে কে ফোন করেছিল জানতে আর অসুবিধা হবে না।

—ঐ লোকটা মাথামোটা হলে আলাদা কথা।

—তার মানে ?

যে এত আটঘাট বেঁধে কাজ করেছে তার পক্ষে এমন একটা স্থূল সূত্র ছেড়ে রাখা সম্ভব নয়। তবে ভুল তো মানুষেই করে। দেখা যাক।

ম্যানেজার চাবি নিয়ে উপস্থিত হলেন।

সময় নষ্ট না করেই সকলে পৌঁছে গেল ২১৬ নম্বর ঘরে। প্রতিদিন ঝাড়া পোঁছা হলেও একটা সোঁদা গন্ধ ঘরে ছেয়ে রয়েছে। নিয়মিত ব্যবহার না করার দরুনই বোধহয় এরকম হচ্ছে। জানলা দুটো খুলে দেওয়া হল। বাসব তীক্ষ্ণ চোখে ঘরের চারধার দেখে নিল কিছুটা সময় নিয়ে। উঁকি মারল বাথরুমেও একবার।

শৈবাল সোফায় বসে পড়েছিল। পরিহার একধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বাসবের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, কলকাতা থেকে আগত এই গোয়েন্দার মাথা বেশ পরিষ্কার। ম্যানেজার একধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিব্রত ভঙ্গী নিয়ে। কবর খুঁড়ে মড়া আবার তুলে আনার এই চেষ্টা কেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

বাসব ম্যানেজারের সামনে এসে দাঁড়াল।

—১২ই জানুয়ারী এই ঘরের যা যা ছিল, এখনও তাই আছে? ভাল করে দেখে নিয়ে বলুন।

ম্যানেজার ঘরের চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

—সব ঠিক আছে।

—বোর্ডারদের জল খাবার কোন ব্যবস্থা ঘরে থাকে না ?

—থাকে।

—জগ, সোরাই বা জল রাখার অন্য কোন পাত্র তো দেখছি না। এমন কি একটা গেলাসও নেই!

—জগ আর গেলাস ছিল। দুর্ঘটনা ঘটার পর ও দুটোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। খোঁজাখুঁজি করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি।

বাসব পরিহারের দিকে ফিরলো।

—জগ আর গেলাস অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ?

পরিহার বললেন, আমিও খুঁজেছিলাম, পাইনি। তাইতো এক্‌জিবিট হিসাবে গেলাস আদালতে উপস্থিত করা যায়নি। ঐ গেলাসেই কিছুর সঙ্গে আর্সেনিউরিক

ক্লোরাইড মিশিয়ে লোকেশকে খাওয়ানো হয়েছিল। হত্যাকারী ধাঁধা সৃষ্টি করার জন্য এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় গেলাস সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে—কিন্তু জগ—

—জগ-মানে ?

—জগটা সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল কেন ?

—ঐ যে বললাম, ধাঁধা বা জটিলতা সৃষ্টি করার জন্য গেলাসটার সঙ্গে জগও নিয়ে গেছে। জল বোধহয় বাথরুমে ফেলে দিয়েছিল।

—হতে পারে আবার নাও পারে। মিঃ ম্যানেজার, অন্য কোন ঘরে দুটো জগের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ?

—না, স্যার।

—আপনাদের জঞ্জাল ফেলার জায়গা কোথায় ?

—ফায়ারস্কেপ একতলায় যেখানে শেষ হয়েছে তার পাশে। ওখানে কোন বোর্ডারের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

—হুঁ। আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। ঘর বন্ধ করুন এবার।

২১৬ নম্বর থেকে বেরিয়ে আসার পর পরিহার বিদায় নিলেন। একটা এনকোয়ারিতে যেতে হবে। ঐ ফ্লোরের বেয়ারা করিডরেই ছিল। তাকে দু কাপ কফি আনতে বলে বাসব ও শৈবাল নিজেদের ঘরে চলে গেল। এয়ারকুলার চালিয়ে দিয়ে দুজনে বসল সোফায়।

—কি বুঝলে ডাক্তার ?

শৈবাল বলল, আমি ভাই এইটুকু বুঝেছি, হারিয়ে যাওয়া জগটার ব্যাপারে তুমি ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছো।

—একজ্যাক্টলি। হত্যাকারী জগটা নিয়ে গেল কেন ? আর নিয়ে গেলই বা কিভাবে ? গেলাস পকেটে নিয়ে যাওয়া যায়। জগ তো পকেটে ঢুকবে না। হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। যে কোন লোকের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে কি ভাবে কাজ গুছিয়েছিল আমায় জানতেই হবে।

—কেন নিয়ে গিয়েছিল বলতে পারবো না। তবে কিভাবে নিয়ে গিয়েছিল তা আন্দাজ করতে পারি।

—কিভাবে ?

—হাতে করেই নিয়ে গিয়েছিল। রাত তখন গভীর, করিডরে কারুর থাকার সম্ভাবনা নেই। কাজেই অসুবিধা কোথায় ?

—আটঘাট বেঁধে যে কাজ করেছে, তার পক্ষে সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে এত

বড় রিস্ক নেওয়া কি সম্ভব? না, ডাক্তার এত সরল পথ ধরে ব্যাপারটা এগোয়নি। সূক্ষ্ম একটা চাল আছেই। আমরা ধরতে পারছি না আলাদা কথা।

কফি এসে পড়ল।

পেয়ালা তুলে নিল দুজনে।

চিন্তার বেড়াজালের মধ্যে দুজনেই এখন বন্দী। মিনিট কয়েক কেটেছে সবে—কফিও শেষ হয়নি, ম্যানেজার দেখা দিলেন। এক্সচেঞ্জের রেজিস্টার সঙ্গে করে এনেছেন। তাঁকে ইঙ্গিতে বসতে বলে বাসব রেজিস্টারটা হাতে নিল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে পৌছল ১২ই জানুয়ারীতে। প্রতি লাইনে সারিবধ্যভাবে লেখা রয়েছে, কোন্ নম্বর বা কোন্ রুম থেকে কে কাকে ফোন করেছে। কাজেই প্রয়োজনীয় লাইনে পৌছতে বাসবের অসুবিধা হল না। লেখা রয়েছে—জেনারেল বুথ থেকে সকাল সাতটা পয়ত্রিশ মিনিটে ২৩০ নম্বর ঘরে কানেকশন দেওয়া হয়েছে।

বাসব মুখ তুলল।

—জেনারেল বুথ মানে—

—নীচে অফিস রুমের পাশে—ম্যানেজার বললেন, প্লাইউড আর কাচে ঘেরা ঘরে ফোনের ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় বোর্ডাররা ঐ-জেনারেল বুথ থেকে কারুর সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করেন।

—বুঝলাম। আর এও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কেউ কাউকে জেনারাল বুথ থেকে ফোন করতে দেখেনি। কারণ আপনারা তখন মৃত লোকেশ ট্যাণ্ডনকে নিয়ে ব্যস্ত। ধন্যবাদ।

বাসব রেজিস্টার ফিরিয়ে দিল।

ম্যানেজার আর কিছু না বলে বিদায় নিলেন।

বাসব শৈবালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

—আমার আন্দাজ মিথ্যা নয় দেখলে তো? এত কাঁচা কাজ সে করবে না। দেখা যাচ্ছে, আমাদের হত্যাকারীর মগজ খুবই পরিষ্কার।

—লোকটাকে ধরা কঠিন হবে কি বল?

—কঠিন শব্দটা আমার অভিধানে নেই তা তুমি জানো ডাক্তার। ভোগাবে। তা আর কি করা যাচ্ছে। প্রাথমিক কাজগুলো কালই শেষ হয়ে যাবে। তার পর এগুবার প্ল্যান ছকে নেবো।

আলোচনা বেশী দূর গড়াল না। ঋতু আর কুশল এসে উপস্থিত হল। প্রাথমিক কথাবার্তার পর কুশল জানতে চাইল, ওদের এখানে কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বাসব জানিয়ে দিল চমৎকার আছে দুজনে।

ঋতু বলল, আপনার কথা মত কাজ করেছি।

—কোন্ কাজ বলুন তো?

—দাদা ও মাথুরদের এখানে আসতে লিখেছি। একথাও লিখেছি, না এলে আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্রজবাবু নিজে হাতে ওঁদের চিঠি দিয়েছেন।

—চমৎকার! ওঁরা আসছেন?

—আজই আসবার কথা।

—কুশলবাবু—

বাসবের ডাকে কুশল মুখ তুলল।

—আদিত্য সোমকে আমার দরকার হবে।

—উনি কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই জানেন না। সেদিন আমাদের মত আটকে পড়ে হোটেলে উপস্থিত ছিলেন এই পর্যন্ত।

—আমি জানি। তবু একবার কথা বলতে চাই। কিভাবে ওঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?

—মিঃ সোম প্রত্যেক মাসেই পাটনা আসেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি, উনি এখন এখানে আছেন কিনা কিংবা কবে আসছেন।

—বেশ। মিসেস ব্যানার্জী এবার আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন করবো?

—বলুন?

ঋতু নড়েচড়ে বসলো।

বাসব মিক্সচারভরা পাইপ হাতে তুলে নিয়ে বলল, এই হোটেলের ২১৬ নম্বর ঘরের ভূগোল আপনার মনে আছে?

—ভূগোল! ও, হ্যাঁ—মনে আছে।

—ঘরে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল?

—ছিল। খাটের বাঁ ধারে একটা স্টিলের র‍্যাকের উপর জগ আর গেলাস রাখা ছিল।

—জগের সাইজ কেমন?

—বেশ বড় সাইজের ঢাকনা দেওয়া স্টেনলেস স্টিলের।

—আপনি একবারও জল খেয়েছিলেন?

—না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, এদিকটা একরকম হল। এবার অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন করছি। মাথুর সাহাব মারা যাবার পর প্রপার্টি নিয়ে দেওরদের সঙ্গে

কোনরকম গোলমাল হয়েছিল ?

—না। গোলমালের কোন সুযোগও ছিল না।

—কি রকম ?

—মাথুর সাহাব আমার নামে উইল করেছিলেন। উইলে এমন চমৎকার ব্যবস্থা ছিল যার দরুন কোন ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

—উইল ! একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি উইল করে বসলেন কি ভাবে ?

—অসুখে পড়ার কয়েকদিন পরেই উনি বুঝে নিয়েছিলেন বাঁচবেন না। পরে যাতে আমি অসুবিধায় না পড়ি তাই বাড়িতে রেজিস্ট্রার ডাকিয়ে উইল রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছিলেন। উইলের এক এক কপি বিনোদবাবু আর প্রমোদবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

—আপনার বাপের বাড়ির লোকরা উইল দেখেছিল ?

—হ্যাঁ।

—আমিও দেখতে চাই।

ঋতু কিন্তু কিন্তু ভঙ্গীতে বলল, এখানে তো নেই। কলকাতায় ব্যাঙ্কের লকারে রাখা আছে। আপনি বললে নিয়ে আসতে পারি গিয়ে।

—কাজটা বিরক্তিকর বুঝি। কাল বলবো।

—উইলের বয়ান যদি জানতে চান, বলতে পারি।

—প্রয়োজন দেখা দিলে আমি উইল খুঁটিয়ে পড়াটাই পছন্দ করবো। আপনাদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয় এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে ? কাউকে পয়েণ্ট করতে পেরেছেন ?

—না। আমরা একেবারেই বুঝতে পারিনি কাজটা কে করেছে।

—আমি অবশ্য ও নিয়ে চিন্তা এখন করছি না। আমার ভাবনার বিষয় হল, খুন আপনার ঘরে হল কেন ?

ঋতু কি বলবে ভেবে পেল না।

বাসব আবার বলল, ঐ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেই আর সমস্ত কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কুশলবাবু আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনি লোকেশ ট্যাণ্ডন খুন হবার আগে ২১৬ নম্বর ঘরে একবারও গিয়েছিলেন ?

—না। ঋতুর সঙ্গে দেখা হবার পর বিপন্ন মানসিক অবস্থা নিয়ে নিজের ঘরেই ছিলাম।

—বললেন ভাল। ধরুন, সকলের চোখ বাঁচিয়ে পরের ঘর থেকে একটা বড় সাইজের জগ আপনাকে আনতে হবে। কিভাবে আনবেন ?

কুশল বিস্মিত গলায় বলল, জগ চুরি করবো ? কেন ?

—যদির কথা বলছি। জগটা আনবেন কিভাবে ?

—খুব সতর্ক ভাবে আনবো।

—পরের চোখে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে কিন্তু।

—ত' অবশ্য থাকছে।

—মিসেস ব্যানার্জী, আপনি কি করবেন ?

মুখে হাসি টেনে ঋতু বলল, জানি না এই প্রশ্ন কেন করছেন। আমি হলে জগটাকে শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাবো।

বাসব নড়েচড়ে বসলো। কয়েক সেকেণ্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঋতুর মুখের দিকে। ওর দৃষ্টিতে যেন কিসের আলো। শৈবাল বুঝলো, কোন একটা ব্যাপারে ও ভারী স্বস্তিবোধ করছে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবার বাসব বলল, আপনার উত্তর আমার খুব কাজে লাগবে।

ঋতুর অবাক হওয়া স্বাভাবিক।

—কি এমন বললাম যাতে—

—যা বললেন তা আমার আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ সম্ভাবনার কথা আমার মনেই পড়েনি! যা হোক. আপনাদের সময় আর নষ্ট করবো না। কাল দেখা হচ্ছে—

শুভরাত্রি জানিয়ে, অবাক ভাব নিয়েই ঋতু ও কুশল বিদায় নিল।

ভাগ্যক্রমে আদিত্য সোম অফিসের কাজে পাটনাতেই ছিলেন। কুশল খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো উনি "আনন্দলোক" হোটেলে যথানিয়মে উঠেছেন। সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে বাসবকে সংবাদ দেওয়া হল। বেলা দশটা আন্দাজ সময় বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পৌছল 'আনন্দলোক'-এ। কুশল ওখানেই ছিল।

মহাসমাদরে ওদের বসালেন আদিত্য সোম।

বললেন হাসি মুখে, আমাকে আপনার মত বিখ্যাত ব্যক্তির যে কোনদিন প্রয়োজন হবে আমি ভাবতে পারিনি। তবে এই ব্যাপারে আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হয় না।

—আমারও তাই মনে হয়—বাসব বলল, তবে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাজিয়ে দেখা তো দরকার। গোটা কয়েক প্রশ্ন করবো, এই আর কি।

—বেশ তো। বলুন ?

—১২ই জানুয়ারী আপনি কখন লোকেশ ট্যাণ্ডনের মৃত্যুসংবাদ পেলেন ?

—সকাল আটটা আন্দাজ সময়।

—কে সংবাদ দিল আপনাকে ?

—বেয়ারা রামনরেশ। আমি বাথরুম থেকে বেরিয়েই ওকে দেখতে পেলাম। তখনই—

—আপনি বাথরুম থেকে বেরিয়ে রামনরেশকে কি অবস্থায় দেখলেন ?

—কি অবস্থায়—একটু ভেবে নিয়ে আদিত্য সোম বললেন, যতদূর মনে পড়ছে সে কারুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। আমাকে দেখেই রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—তারপর ?

—আমাকে বলল দুর্ঘটনার কথা।

—কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল আপনি জানতে চেয়েছিলেন ?

—না। খুনের ব্যাপারটা জানার পর আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সময় নষ্ট না করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

বাসব বলল, এই তো গেল ১২ই জানুয়ারীর কথা। এবার কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে পড়া যাক। ১১ই জানুয়ারী রাত্রে কটায় আপনি নিজের ঘরে যান ?

—আমি আর কুশলবাবু একই সঙ্গে ডিনার সেরে যে যার নিজের ঘরে চলে যাই। তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে।

—রাত্রে বোধ হয় ঘর থেকে আর বাইরে আসেননি ?

—একবার আসতে হয়েছিল।

—কত রাত্রে ?

—সাড়ে এগারটা আন্দাজ।

বাসব নড়েচড়ে বসলো।

—ঐ অসময়ে ঘরের বাইরে এলেন কেন ?

—আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল। বেল বাজালাম কয়েকবার। বেয়ারা এল না। অগত্যা তখন নিজেই বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। নীচে নেমে গিয়ে কাউন্টার থেকে সিগারেট নিয়ে এলাম।

—যাবার সময় বা আসবার সময় করিডরে কাউকে দেখেছিলেন ?

—কাউকে ?

আদিত্য সোম ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড ভাবলেন।

—একজনকে দেখেছিলাম ঘরে ঢুকে যেতে।

—কত নম্বর ঘরে ?

—নম্বর বলতে পারবো না। আমি লক্ষ্য করিনি।

বাবল বলল, এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করছি। ফ্লোর চার্ট আমি দেখেছি। করিডরের একধারে আছে, ২০১ থেকে ২১৫ নম্বর ঘর—অন্য ধারে ২১৬ নম্বর থেকে ২৩০ নম্বর ঘর। কুশলবাবুর ঘর কত নম্বর আপনি জানতেন?

—জানতাম।

—আপনি যখন নিজের ঘর থেকে বেরুলেন তখন কুশলবাবুর ঘর আপনার বাঁ দিকে পড়ল না, ডান দিকে পড়ল?

—ডান দিকে।

—এবার বলুন সেই লোকটা বাঁ ধারে কোন ঘরে ঢুকে ছিল, না ডান ধারের কোন ঘরে?

আদিত্য সোম চিন্তিত গলায় বললেন, বাঁ ধারের কোন ঘ'র।

—অর্থাৎ আপনি যে ধারে ছিলেন, লোকটা সেই ধারের কোন ঘরে ঢুকেছিল। এবার বলুন, আপনার ঘরের কটা ঘরের পর সেই ঘর?

—কটা ঘরের পর—

—হ্যাঁ। ভাল করে ভেবে বলুন।

—যতদূর মনে হচ্ছে, তিনটে বা চারটে ঘরের পরের ঘরে সেই লোকটা ঢুকেছিল।

—তার মানে ২১৬ বা ২২৫ নম্বর ঘর। কুশলবাবু—

কুশল একমনে প্রশ্ন-উত্তর শুনছিল। তাকে চটকা ভাঙল।

—বলুন?

—ঐ দুই ঘরের বোর্ডার কে কে ছিল বলতে পারেন?

—আমি বলতে পারবো না। ঋতু কোন ঘরে ছিল আমি শুধু তাই জানতাম।

—অবশ্য জেনে নেওয়া খুব কঠিন হবে না। এয়ারলাইন্স হোটেলের ম্যানেজার রেজিস্টার দেখে বলে দিতে পারবেন। মিঃ সোম, এবার বলুন, যে লোকটা ঘরে ঢুকে গিয়েছিল সে কি আপনার চেনা লোক?

সোম বললেন, কুশলবাবু ছাড়া ওখানে আমার আর কোন চেনা লোক ছিল না। তাছাড়া লোকটার মুখ আমি দেখতে পাইনি। তার পিছন দিকটাই আমার নজরে পড়েছিল।

—সাজপোশাকের আন্দাজ নিশ্চয় দিতে পারবেন?

—একই রংয়ের পাজামা এবং সার্ট পরে ছিল লোকটা যতদূর মনে পড়ছে আমার।

—অর্থাৎ স্লিপিং স্যুট। এবার মনের উপর একটু জোর দিয়ে বলুন, স্লিপিং

স্যুটের রং কি ছিল ?

আদিত্য সোম ভাবতে লাগলেন।

বললেন শেষে, আমি খুব নিশ্চিত নই। পোশাক ছাই বা শ্লেট রংয়ের ছিল বোধ হয়।

—ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার কিছুটা উপকারই হল বলা চলে। এবার উঠবো।

—উঠবেন কি রকম ? ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা আছে। হুইস্কি বা জিন কিছু একট. পছন্দ করুন।

মুখে হাসি টেনে বাসব বলল, কফির ব্যবস্থা করুন। বেশ মানানসই হবে। ডাক্তার, তুমি কি বল ?

পরের দিন সকালে, রাকেশ, বিনোদ এবং প্রমোদকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজবাবু দেখা দিলেন। আগের দিন রাত্রে তিনজন পাটনায় এসেছেন। শ্বশুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও সফল হলেন না। তখন অনিচ্ছুক ব্রজবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাসবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বাসব ব্রজবাবুকে যেতে বলে তিনজনকে বসালো।

বিনোদ বললেন, এ কি ধরনের জুলুম মশাই ? আমাদের এই ভাবে এখানে আনা হল ! বৌদি কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে গেছেন, ব্যাপারটা মিটে গেছে। আবার কি ?

বাসব নির্লিপ্ত গলায় বলল, ব্যাপারটা মিটলো কোথায় ? হত্যাকারী কে জানা যায়নি।

—তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। আদালতে রায় হয়ে গেছে, আর খোঁচাখুঁচি করে লাভ কি ?

—আপনার কথা শুনে সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার মক্কেল যে ইনিসিয়েটিভ নিয়েছেন তা আপনার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। উপরন্তু আপনি অসহযোগিতার ভাব দেখাচ্ছেন ? লোকেশ ট্যাণ্ডন আপনার স্ত্রীর ভাই ছিলেন। তাঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার নৈতিক দায়িত্ব তো আপনারই সবচেয়ে বেশী।

বিনোদ কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

বাসব আবার বলল, আপনারা আমার সম্পর্কে কতটুকু কি জানেন তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। বেসরকারী তদন্তের উপর আপনাদের আস্থা আছে কি নেই তাও আমার কাছে গৌণ প্রশ্ন। তবে, আমি যে সমস্ত প্রশ্ন করবো

তার সঠিক উত্তর তিনজনই দেবেন। কোন রকম অসহযোগিতার চেষ্টা করলে, ডি. আই. জি. সি. আই. ডি.'র সামনে উপস্থিত হতে হবে।

রাকেশ বলল, থ্রেটন করার দরকার নেই। একবার পুলিসকে, দ্বিতীয়বার আদালতে যা বলবার বলেছি। এই তৃতীয় বারেও আমি তৈরী আছি। কি জানতে চা'ন বলুন?

—ধন্যবাদ। আপনাদের তিনজনের সামনেই তিনজনকে প্রশ্ন করবো। রাকেশ-বাবু, এয়ারলাইন্স হোটেলের কত নম্বর ঘরে আপনি ছিলেন?

—২১৩ নম্বর ঘরে।

—পরে এসেও এত কম নম্বরের ঘর পেলেন কি ভাবে?

—বলতে পারবো না। ম্যানেজার ঐ ঘরই আমার জন্য অ্যালট করেছিলেন। ১৩ নম্বর অশুভ। হয়তো এই কারণেই ঘরটা খালি ছিল।

—হতে পারে। বোনের সঙ্গে দেখা করার পর আপনি কি করলেন? নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন?

—না। বিনোদবাবুর ঘরে গিয়েছিলাম। মিনিট পনেরো ছিলাম ওখানে। তারপর নিজের ঘরে শুতে চলে যাই।

—ঘরে আর কে কে ছিল?

—বিনোদবাবু ছাড়া প্রমোদবাবু ছিলেন। লোকেশও ছিল।

—কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল আপনাদের মধ্যে?

—ঋতুর বিয়ে নিয়ে। ওকে সহজে রাজী করানো যাবে না সে সম্পর্কে আমরা একমত হয়েছিলাম।

—একজন স্বাধীন, ম্যাচিওর্ড লেডিকে বিয়ে—বিয়ে করে অস্থির করে তোলার অর্থ কি? বিশেষ নিজের ছোট বোনকে এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়াটা কি শোভনীয়?

গম্ভীর মুখে রাকেশ বলল, ব্যক্তিগত ব্যাপার টেনে আনছেন কেন? ঋতুর ভালর দিক চেয়েই আমরা পরিকল্পনাটা করেছিলাম।

—উনি কিন্তু কুশল ব্যানার্জীকে বিয়ে করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ওঁর ভাল কিসে হবে। থাক ওকথা। আপনার তো কারবার আছে। কিসের কারবার বলুন তো?

—এলাহাবাদের জর্জটাউন অঞ্চলে আমার বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। এছাড়া পাটনায় পার্টনারশিপে প্লাইউডের ব্যবসা করি।

—সেদিন বিনোদবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—ভোর হবার আগে একবারও বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে ?

—না।

—আপনি কি পরে শুয়েছিলেন সে রাতে ?

বিস্মিত গলায় রাকেশ বলল, অদ্ভুত প্রশ্ন আপনার। কোট খুলে রেখে, প্যান্ট আর সার্ট পরে শুয়েছিলাম। সঙ্গে তো আমার কিছু ছিল না।

—ঠিকই তো। আপনি খালি হাতে হোটেলে পৌঁছেছিলেন। এবারের প্রশ্নটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে আপনার বোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। লোকেশ ট্যাণ্ডনকে অন্য কেউ খুন করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় এ-সম্পর্কে আপনি চিন্তা ভাবনা করেছেন। আপনার ধারণায় হত্যাকারী কে হতে পারে ?

—আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেও বুঝতে পারিনি কে এই কাজ করেছে। তবে—

—বলুন ?

—লোকেশ ড্রিঙ্ক করতো। তার গেলাসে নিশ্চয় কেউ মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে দিয়েছিল। ঋতুর দুর্ভাগ্য যে, লোকটা তার ঘরে গিয়ে মারা গেল।

তীক্ষ্ণ গলায় বিনোদ বলল, কি য-তা বলছেন ? আমি ঐ সাংঘাতিক জিনিসটা লোকেশের গেলাসে মিশিয়ে দিয়েছি ?

—আমি সে কথা বলিনি।

—প্রকারান্তরে তাই বলেছেন। লোকেশকে খুন করার আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? রাকেশবাবু, আপনার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

রাকেশ কিছু বলতে যাবার আগেই বাসব বলল, অহেতুক তর্কবিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। আমরা যাতে সমস্যার কূলে ঠাণ্ডা মাথায় পৌঁছতে পারি সেই চেষ্টাই দেখবো। বলুন তো, ড্রিঙ্কের ব্যাপারটা কি ?

বিনোদ বললেন, লোকেশ হুইস্কির ভারী ভক্ত ছিল। সেদিনকার জল-হাওয়া ড্রিঙ্ক করার পক্ষে বেশ অনুকূল মনে হয়েছিল। আমরা ড্রিঙ্ক করতে করতে গল্পগুজব করছিলাম। ঐ সময় রাকেশবাবু আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। উনি নিজেও ড্রিঙ্ক করেছিলেন। অথচ এখন তার অন্য অর্থ করছেন !

—লোকেশ কি খুব বেশী ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিল ?

—কম করেও পাঁচ পেগ খেয়েছিল।

—কোর্ট-কাছারি তো মিটে গেছে। এবার সত্যি কথা বলুন, আপনারা কি বিয়ের ব্যাপারে লোকেশকে উত্তেজিত করেছিলেন তখন ?

বিনোদ ইতস্ততঃ করে বলল, আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, আমরা তো চেষ্টা করছি, তোমার এত সাহসের অভাব কেন ? তুমি কেন সরাসরি বৌদির সঙ্গে কথা বলছো না। লোকেশ আমার কথায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।

—তারপর ?

—তারপর…মানে…

এতক্ষণ পরে প্রমোদ কথা বলল।

—এখন আর হেজিটেড করে লাভ কি ? যা হয়েছিল বলে দাও। এই ধরনের ছেলেমানুষিতে আমার একেবারেই সায় ছিল না।

বিনোদ বলল, পুলিসকে ইচ্ছে করেই আমরা কথাটা বলিনি। ভেবেছিলাম, হয়তো আমরাই বিপদে পড়ে যাবো। ব্যাপারটা হল, নিজেকে সাহসী প্রতিপন্ন করার জন্য লোকেশ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে বৌদির ঘরে গিয়েছিল পরিষ্কার ভাবে কথা বলে নিতে।

—তখন কটা ?

বাসবের প্রশ্নের উত্তরে রাকেশ বলল, আন্দাজ সাড়ে দশটা।

—এই ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার দরুন আদালতে কত মিথ্যার আশ্রয় আপনাদের নিতে হয়েছে একবার ভেবে দেখুন। যাহোক, ২৩০ নম্বর ঘরে যে ভদ্রলোক সেদিন ছিলেন তাঁকে আপনারা কেউ চেনেন ?

প্রমোদ প্রশ্ন করল, কি নাম ভদ্রলোকের ?

—আদিত্য সোম।

—আমি চিনি না।

বাকী দুজনও অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

—প্রমোদবাবু, আপনি সেদিন কত নম্বর ঘরে ছিলেন ?

—২২১ নম্বর।

—সেদিন রাত্রে শোবার সময় আপনি কি পোশাক বদলে ছিলেন ?

—হ্যাঁ। লুঙ্গি আর পুরোহাতা পশমের গেঞ্জি পরেছিলাম।

—বিনোদবাবু, আপনিও কি পোশাক পাল্টেছিলেন ?

বিনোদ বলল, স্যুট পরে তো শোওয়া যায় না।

—বটেই তো। কি পরেছিলেন ?

—লুঙ্গি আর ফ্লানেলের সার্ট।

বিস্মিত গলায় প্রমোদ বলল, তুমি তো লুঙ্গি পছন্দ করো না। হঠাৎ সেদিন কি ভাবে—

—পরেছিলাম। রাত কাটাবার পক্ষে লুঙ্গি ভারি কমফার্টেবল ব্যবহার করেই বুঝেছি। তুমি ঠিকই বলতে।

বাসব বলল, সার কথাটা এই, সে রাত্রে আপনারা কেউই শ্লিপিং স্যুট পরেননি। আমার হিসাবে ভুল ছিল দেখা যাচ্ছে।

প্রমোদ বলল, সে রাত্রে আমরা কেউ স্যুট ব্যবহার করেছিলাম কি না তা জানবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করছেন কেন?

—কারণ একটা আছে।

—আমাদের বোধ হয় বলা যাবে না?

—যাবে না কেন? ঐ যে, ভদ্রলোকের নাম করলাম, আদিত্য সোম। উনি সে রাত্রে একজন শ্লিপিং স্যুট পরা লোককে একটা ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন। আজ এই পর্যন্ত। আপনাদের আর অপেক্ষা করাবো না। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। তবে একটা কথা, আজই চলে যাবেন না। কয়েকদিন আপনারা পাটনায় থেকে গেলে ভাল হয়। আচ্ছা—

আর কথা না বাড়িয়ে তিনজনে বিদায় নিলেন।

বাসব সোফায় হেলে বসে পাইপ ধরাল। চিন্তামুক্ত মুখে ধোঁয়া ছেড়ে চলল একমনে। শৈবাল এতক্ষণ খাটের উপর আধশোওয়া অবস্থায় ছিল। এবার উঠে গিয়ে রুমসার্ভিসকে ফোন করল। পাঠিয়ে দিতে বলল দু কাপ কফি।

বাসব দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে নিয়ে বলল, কেমন শুনলে ডাক্তার?

—মন্দ নয়। তবে তোমার হিসাবের ভুলটা ধরতে পারলাম না।

—কথাটা ওদের সামনে ইচ্ছে করেই বলেছিলাম। আমার হিসাবে কোন ভুল নেই। প্রমোদ মাথুরের বেফাঁস কথাতেই বুঝতে পারা গেছে, লুঙ্গি নয়, বিনোদ মাথুর শ্লিপিং স্যুট পরেই ছিল।

—আদিত্য সোমের আন্দাজ তাহলে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। বিনোদ মাথুরের ঘরের নম্বর ছিল ২১৬। কিন্তু ঐ অসময়ে উনি ফিরছিলেন কোথা থেকে?

—আমার হিসাবকে যদি আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে বলতে হবে, উনি ঋতু মাথুরের ঘর থেকে ফিরছিলেন?

—তুমি বলতে চাইছো—

—এখন আমি আর কিছু বলতে চাই না। তোমাকে একটা প্রশ্ন করবো ভাবছি।

—জটিল না হলে আমি নিশ্চয় উত্তর দেব।

—তুমি অবশ্য মদ খাও না। লিকারের প্রভাব সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা না থাকারই কথা। তবু প্রশ্ন করছি, ডাক্তার হিসাবে যদি কিছু জানা থাকে। বেশি

ড্রিঙ্ক করতে যারা অভ্যস্ত তারা মাতাল হয় না ঠিকই, তবে কোন অস্বস্তিবোধ নিশ্চয় দেখা দেয়। সেটা কি? অন্য কিছুর প্রয়োজন সে কি তখন অনুভব করে?

চিন্তিত গলায় শৈবাল বলল, আরো মদ খাবার তাগিদ তার মনে তখন থাকে। তবে তোমার মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে তুমি যখন পাইপ ধরলে তখন আমাকে হুইস্কি বা জিন কিছু একটা ধরতে বলেছিলে?

—বলেছিলাম। তোমাকে তো মদ ধরানো গেল না।

—তখন আমরা দুটো বই কিনে এনেছিলাম পার্ক স্ট্রীটের এক দোকান থেকে "হাউ-টু ইউজ পাইপ" আর "লিকার হ্যাবিট"। দুটোই বিশ্ববিখ্যাত বই। "লিকার হ্যাবিট" পড়ে জানা গেছে একই ধরনের ওয়াচট প্রত্যেক ডেড ড্রিঙ্ক লোকের হবে তার কোন মানে নেই। কারুর ঘুম পেয়ে যায়। কেউ আবোলতাবোল বকতে থাকে। যাদের নার্ভ স্ট্রং তাদের মধ্যে অনেকে পায়চারী করতে থাকে, অনুশোচনা আসে, কারুর আবার তেষ্টা পায়—

—কি বললে? তেষ্টা পায়?

—জল খাবার ইচ্ছে হয় আর কি।

—ব্রেভো ডাক্তার। তোমার এই কথাতে যে আমার কি উপকার হল তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না। মোটামুটি ছবিটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিস্মিত গলায় শৈবাল বলল, অবাক কাণ্ড। কোন কোন ড্রাঙ্কারের তেষ্টা পায়, এতে তোমার এত উচ্ছ্বসিত হবার কারণ কি?

—যথেষ্ট কারণ আছে ডাক্তার। খুনের মোটিভ আমি ধরে ফেলেছি। আমার মক্কেলের ঘর থেকে জগটা কেন সরিয়ে নেওয়া হল এখন বুঝতে আর অসুবিধা হচ্ছে না।

এই সময় বেয়ারা এসে দু কাপ কফি দিয়ে গেল।

বাসব কাপ তুলে নিয়ে আবার বলল, গেলাসের অনুপস্থিত মেনে নেওয়া যাক। পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরকম করা হয়ে থাকে। কিন্তু জগ—? মন ভারি খুঁতখুঁত করছিল। জগ লোপাট করার কারণ কি? ভাগ্যক্রমে তুমি অজান্তেই সমস্যার সমাধান করে দিলে।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তুমি বললে না কারুর কারুর বেশি ড্রিঙ্ক করার পর তেষ্টা পায়। লেবেশ ঐ ক্যাটাগরির। তার তেষ্টা পেয়েছিল।

—মেনে নিলাম তেষ্টা পেয়েছিল। তার সঙ্গে জগ লোপাটের কি সম্পর্ক?

—অত্যন্ত নিবিড়। এখনও বুঝতে পারছ না, জগের জলেই মারকিউরিক

ক্লোরাইড মেশানো ছিল। তার থেকে জল ঢেলে খেতে দেওয়া হয়েছিল লোকেশকে। কাজেই জগ আর গেলাস দুটোই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

—কিন্তু লোকেশ যে ওখানে আসবে, এলেও যে জল খাবে তার তো কোন স্থিরতা ছিল না।

—তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে ডাক্তার। সঠিক জায়গায় ঘা মেরেছো। লোকেশকে মারতে গেলে তার ঘরের জগের জলেই মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে রাখা উচিত ছিল। আমার মক্কেলের ঘরে ঐ ব্যবস্থা কেন করে রাখা হয়েছিল?

শৈবাল উত্তেজিত ভাবে বলল, তুমি কি বলতে চাইছো, ঋতু মাথুরকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল, ঘটনাচক্রে লোকেশ বেঘোরে মারা পড়েছে?

মুখে হাসি টেনে বাসব বলল, আমি ঐ কথাই বলতে চাইছি। উনি কখনও না কখনও জল খেতেন আর মারা পড়তেন। ভালবাসার আকর্ষণে উনি কুশলবাবুর ঘরে চলে যাওয়ায় বেঁচে গেলেন। তবে এখানে একটা বড় প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে।

—কোন্ প্রশ্ন?

—যদি ধরে নেওয়া যায়, লোকেশ ২১৬ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখল, ঋতু নেই। সে অপেক্ষায় রইল। এই সময় ড্রিংকের জের টেনে তার তেষ্টা পেয়ে গেল। জগ থেকে গেলাসে জল ঢেলে সে খেল এবং মারা পড়তে তার এরপর কয়েক মিনিট মাত্র সময় লাগলো। বড় ধরনের একটা প্রশ্ন এর পরই দেখা দিচ্ছে। জগ আর গেলাস ওখান থেকে অদৃশ্য হল কিভাবে? ঐ দুটো জড় বস্তুর নিশ্চয় পা ছিল না?

—আরো একজন লোক ওখানে উপস্থিত ছিল।

—নিশ্চয় উপস্থিত ছিল। নইলে হিসাব মিলবেই না। হিসাবকে সঠিক ভাবে মেলাতে গেলে কিন্তু আরো কয়েকটা প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটা ওখানে গেল কেন? সে কি জানতো ঋতু ঘরে নেই? ঐ লোকটাই কি আসল কালপ্রিট? তাই যদি হবে, তবে লোকেশকে জল খাওয়ালো কেন বা তাকে জল খেতে বাধা দিল না কেন?

—পরিস্থিতি সহজ হয়ে আস্তে, আস্তে আবার জটিল হয়ে উঠল।

—আরো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। একটা পয়েণ্ট মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। দেখি, ঐ পথ ধরে এগুনো যায় কিনা।

—পয়েণ্টটা কি?

বাসব হাই তোলার পর বলল, পরে বলব। বেশ খিদে পেয়ে গেছে ডাক্তার। যুতের এক মেনু তৈরী করে রুম সার্ভিসকে জানাও।

কুশল রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল— এগারটা চল্লিশ।

কিছুক্ষণ আগে মোকামাকে পিছনে ফেলে এসেছে কোচিন এক্সপ্রেস। ভারী ভাল ট্রেন। কোন কারণে আজই লেট-রান করেছে। আর কোন স্টপেজ নেই।

প্রান্তীয় স্টেশন হল পাটনা।

কুশল সিগারেট ধরাল।

ঋতু বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এল এই সময়। বাসবের কথায় ওরা কলকাতা গিয়েছিল। মাথুর সাহাবের উইল লকার থেকে বার করে বিকেলের ট্রেনেই রওয়ানা হয়ে পড়েছে। আর তো কোন কাজ ছিল না কলকাতায়। ভাগ্যক্রমে কোচিন এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন পাওয়া গিয়েছিল।

ঋতু কুশলের গা ঘেঁষে বসে বলল, আজ সকাল থেকেই দেখছি তুমি একটু গম্ভীর মুডে রয়েছো?

—তুমি কাছে রয়েছো, আর আমি গম্ভীর থাকবো?

—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না বেঞ্জ। বল না, কি হয়েছে?

কুশল ঋতুকে নিজের কাছে টেনে নিল।

—সত্যি কথা বলতে কি কিছুই হয়নি। আমি একটা কথা ভাবছি।

—যা ভাবছো, তা কি আমাকে বলা যায় না?

—তোমাকে বলা যাবে না, এমন কোন কথা আমার থাকতে পারে না। ভেবেছিলাম, তোমার মনোবাঞ্ছাই বোধহয় এবার পূর্ণ হল। যে রকম ফাঁকিবাজি চলেছে—চাকরি থাকলে হয়।

—সত্যি যদি চাকরি চলে যায় আমি একটা ভাল প্রস্তাব দেবো। তোমার মর্যাদাবোধে যাতে ঘা না লাগে সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকবে মনে রেখো।

—প্রস্তাবটা কি শুনি?

—এখন বলা যাবে না।

—কেন?

ঋতু দু হাত দিয়ে কুশলের গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর চাপা গলায় বলল, আগে তোমার চাকরিটা যাক।

কুশল হেসে ফেলল।

—তোমাকে নিয়ে যে কি করবো সময় সময় ভেবে পাইনা। চাকরি না যাওয়া পর্যন্ত ঐ-আলোচনা মুলতুবি থাক, কি বল?

ঋতু ওর গালে ঠোঁট ঠেকিয়ে সরে এল।

—তাই থাক। এবার একটা কাজের কথা বলি। উইলের জেরক্স করিয়ে নিলে

ভাল হত। জেরক্স কপি দিয়ে দিতাম মিঃ ব্যানার্জীকে। আসলটা আমাদের কাছেই থাকতো।

—কাল পাটনায় করিয়ে নেবো। উইল উনি কেন দেখতে চাইছেন বল তো?

—বুঝতে পারছি না। বেঙ্গ, উনি আমাকে বা তোমাকে সন্দেহ করছেন না তো?

—আমাদের সন্দেহ করবেন কেন? আমরাই তো ওঁকে এই কেসে নিযুক্ত করেছি। আমরা হত্যাকারী হলে নিজেদের কবর খুঁড়তে যাব কেন?

—তা ঠিক। তবে—

—থামলে কেন?

দু-বার্থ এসি কম্পার্টমেণ্ট। ঘাম হবার সম্ভাবনা নেই। তবু ঋতু আঁচল দিয়ে নিজের মুখ মুছে নিল। বিয়ের পর ওর চেহারার জৌলুস অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সময় সময় কুশলের মুগ্ধ দৃষ্টি তার মত সপ্রতিভ প্রগাঢ় যৌবনাকেও রাঙিয়ে তোলে।

—জগের ব্যাপারটা বলছিলাম। আমি হলে জগটা শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যেতাম বলতেই মিঃ ব্যানার্জী কি রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল তোমার মনে আছে?

—মনে হচ্ছিল. উনি যেন একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

—ব্যাপারটা কি বল তো? এই তদন্তর সঙ্গে একটা জগের কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আছে নিশ্চয়। তবে একটা কথা তোমায় বলতে পারি, বাসববাবুর হাতে যখন তদন্তের ভার রয়েছে তখন অপরাধী ধরা পড়বেই।

ঋতু কিছু বলার আগেই দরজায় টোকা পড়ল।

দুজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

কুশল উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই যাদের দেখলো তা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মত। দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে বিনোদ আর প্রমোদ। ঋতুও এগিয়ে এসেছিল। বিরক্তিতে ওর ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে।

কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, কি চাই আপনাদের?

দ্বিধাজড়ানো গলায় বিনোদ বলল, এসময় বিরক্ত করাটা ঠিক হয়নি। আসল কথাটা হল, কাজটা খুব জরুরী।

—পরে কলকাতা বা পাটনায় বললে চলতো না? এই চলন্ত ট্রেনে বিরক্ত করতে এসেছেন। বেঙ্গ, এঁরা কি ভেল্কি জানেন? এই ট্রেনে আমরা যাচ্ছি আর কারুর তো জানার কথা নয়।

প্রমোদ বলল, আমরাও জানতাম না। গোয়েন্দা ভদ্রলোকের অনুমতি নিয়ে একদিনের জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনেই আপনাকে দেখেছিলাম।

কোন্ কামরায় আছেন জানি না তো। খোঁজ করতে করতে করিডর দিয়ে কণ্ডাক্টরকে অনেক বলেকয়ে এখানে এলাম।

ওদের কামরার মধ্যে আহ্বান না করেই ঋতু বলল, আপনাদের দেখে আমি মোটেই খুশী হচ্ছি না। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।

—কিছু সময় লাগবে। তাছাড়া একান্তে বলতে চাই।

—না। যা বলবার বেঞ্জের সামনেই বলতে হবে।

—বৌদি—মানে—

—আমাকে মিসেস ব্যানার্জী বলুন।

বিনোদ বলল, প্রমোদ, কথা বাড়িও না। ব্রজবাবুর মুখে শুনলাম, আপনি নিজের অংশের ব্যবসা বেচে ফেলতে চান?

—ঠিকই শুনেছেন।

—এটা আমাদের পৈতৃক ব্যবসা…মানে…পারিবারিক প্রতিষ্ঠান…

ভ্রূ সোজা না করে ঋতু বলল, আপনাদের পৈতৃক ব্যবসা হতে পারে, আমার নয়। আমি পেয়েছি। এখন স্থির করেছি বেচে দেবো। এতে তো কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না।

—আপনি ঠিকই বলছেন। আমরা বলতে এসেছিলাম, আপনার অংশটা কিনে নিতে চাই। ঘরের জিনিস তাহলে ঘরেই থেকে যাবে।

—আপনাদের নিজের অংশ বেচবো কে বলল?

—কেউ বলেনি। আমরা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

তীক্ষ্ণ গলায় ঋতু বলল, আমি দুঃখিত। বাজারে যে দর উঠবে তার চেয়ে দশ গুণ বেশী দিতে চাইলেও আমি আপনাদের বেচবো না। আপনারা তো স্বার্থপর। স্বার্থের মুখ চেয়ে সব কিছু করতে পারেন। পারিবারিক প্রতিষ্ঠার কথা তখন তো ভাবেননি—আমাকে ঠেলে দিয়েছিলেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

বিনোদ কিছু বলতে যাবার আগেই ঋতু ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। ফিরে দাঁড়াল কুশলের দিকে। ওর মুখে উচ্ছ্বাসের দীপ্তি ছেয়ে রয়েছে।

—কি বুঝলে?

কুশল হালকা গলায় বলল, বুঝলাম এইটুকুই, এই রকম একটা সুযোগ তুমি খুঁজছিলে। ভাগ্যক্রমে ওরাই তোমাকে সুযোগ করে দিল।

—ঠিক বলেছো। এখন নিজেকে ভারি হালকা লাগছে।

ট্রেনের গতি কমে এল এই সময়।

কুশল রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, মালপত্র ঠিক করে নেওয়া

যাক। আমরা এসে পড়েছি।

বাসব সকালেই বেরিয়েছিল। মিঃ মেহরার সহযোগিতায় কি একটা কাজ রয়েছে। শৈবাল একাই সোফায় আড় হয়ে বসে দৈনিক পত্রের উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। নটা আন্দাজ সময় ব্রজবাবু এলেন। হাতে তাঁর স্বর্গীয় মাথুর সাহেবের উইলের জেরক্স কপি। ঋতু পাঠিয়ে দিয়েছে। এই সঙ্গে বলে পাঠিয়েছে, পরে বাসবের সঙ্গে দেখা করবে।

শৈবাল ব্রজবাবুকে বসালো।

পাটনা সম্পর্কেই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। বাসব ফিরে এল আধ ঘণ্টাটাক পরে। ওর মুখের ভাব বলে দিচ্ছে, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

ব্রজবাবুকে দেখে খুশী হল।

বসতে বসতে বলল, আমি ভাবছিলাম, আপনাকে ডেকে পাঠাবো। উইল নিয়ে এসেছেন বোধহয়। আপনার ম্যাডাম কোথায়?

ব্রজবাবু উইলের কপি এগিয়ে বললেন, আজ কোন সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। অনেক রাত্রে কাল ফিরেছিলেন। ক্লান্তির জন্যই…মানে—

—ঠিক আছে।

বাসব এবার শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বোধহয় এবার রিটায়ার করা উচিত।

শৈবাল অবাক।

—কেন?

—ধারাবাহিক ভাবে কোন কাজ করতে পারছি না। তোমার মনে আছে বোধ হয়, আদিত্য সোমের ঘরে রামনরেশকে কে ফোন করেছিল জানবার জন্য হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার আনিয়েছিলাম?

—আনিয়েছিলে। কিন্তু জানা যায়নি, রামনরেশকে কে ফোন করেছিল। এতে হয়েছেটা কি?

—হয়েছে ডাক্তার। আমি যে কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট করে ফেলছি এটাই তার উদাহরণ। তুমি বল, আমার কি উচিত ছিল না, সেদিন বা তার আগের দিন কে কাকে ফোন করেছে তাও দেখে নেওয়া।

—বেশ তো। এখন দেখে নাও।

—ঘরে আসবার আগে দেখে নিয়েছি। তবে এই ভাবে চলতে থাকলে কত দিন লাইনে টিঁকে থাকতে পারবো বল?

ব্রজবাবু অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিলেন।

বাসব এবার ওঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের আলোচনার মধ্যে পড়ে হিমসিম খাচ্ছেন বোধ হয়? আর সময় নষ্ট করবো না। আচ্ছা ব্রজবাবু, আপনি ফুলপ্যাণ্ট পরেন না?

এই ধরনের প্রশ্নে যে কেউ অবাক হবে।

বিস্ময় মাখানো গলায় ব্রজবাবু বললেন, না স্যার। আমি কখনও ফুলপ্যাণ্ট ব্যবহার করিনি। ধুতি-সার্ট পরেই এতদিন কাটিয়ে দিলাম।

—এগারই জানুয়ারী তো এখানে খুব ঠাণ্ডা ছিল। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য সেদিন বোধ হয় কোর্ট ব্যবহার করেছিলেন?

—ফুলহাতা সোয়েটার পরেছিলাম। শাল জড়িয়ে নিয়েছিলাম তার উপর।

এই ধরনের প্রশ্ন শুনে শৈবালও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বাসব বলল, একটা সমস্যা মিটল। এবার আসল কথায় আসছি। আপনি পুলিসকে বলেছেন, সেদিন রাত দশটার সময় ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। বিয়ার না কি খেয়ে ফেলার দরুন সময় ঠিক রাখতে পারেননি। পরে গিযে দেখেন ম্যাডাম ঘরে নেই। আপনি তখন নিজের ঘরে ফিরে এসেছিলেন—এই তো?

—হ্যাঁ। ম্যাডাম সময় মেপে কাজ করেন। ভেবেছিলাম পরের দিন আমাকে বকুনি খেতে হবে।

—জগটা কি করলেন?

আকাশ থেকে পডলেন ব্রজবাবু।

—জগ? কোন্ জগ?

—শুধু জগ নয়, গেলাসও। আপনার ম্যাডামের ঘরে ও দুটো ছিল। পরে পাওয়া যায়নি।

—আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

বাসব নির্লিপ্ত গলায় বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি সবই জানেন। শুধু এই নয়, আরো মিথ্যা কথা বলেছেন।

ব্রজবাবু ককিয়ে উঠলেন, আমি স্যার…মানে…আমি তো…

—সঠিক ভাবে উত্তর দিন। যদি বিপদে পড়তে চান স্বতন্ত্র কথা। সেদিন বিয়ারের ঝোঁক কেটে যাবার পরই ম্যাডামের ঘরে যাননি। ফোন করেছিলেন। এই কিছুক্ষণ আগে আমি হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার দেখেছি। রেকর্ড বলছে সেদিন রাত দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আপনি ২১৬ নম্বর ঘরের নম্বর চেয়েছিলেন। এর অর্থ হল, সাড়ে দশটার আগে আপনি ম্যাডামের ঘরে যাননি। এবার সত্যি

কথাটা বলুন ?

ব্রজবাবু কিছু বলতে গিয়ে থামলেন। ঘামে সারা মুখ ভিজে উঠেছে। ভারী নার্ভাস দেখাচ্ছে ওঁকে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। হেঁচকি তোলার মত মুদ্রা তাঁর শরীরে দেখা গেল।

বাসব আবার বলল, আপনার ভালর জন্যই বলছি, অকপটে সব কথা আমায় বলুন। নইলে আমাকে পুলিসে খবর পাঠাতে হবে। তখন কিন্তু ঝামেলা আপনাকে জড়িয়ে ফেলবে।

হাত জোড় করে কাঁপা গলায় ব্রজবাবু বললেন, আমি কোন অপরাধ করিনি স্যার। এমন অবস্থায় পড়ে গিয়েছিলাম—আমার মনে হয়েছিল ম্যাডামকে কেউ মেরে ফেলতে চায়। তাঁর ভালর জন্যই…মানে…ওঁর অনেক নুন খেয়েছি স্যার…

—সব কথা খুলে বলুন। সত্যি যদি কোন অপরাধ না করে থাকেন, কথা দিচ্ছি কোন আঁচ আপনার উপর আসতে দেব না।

—ম্যাডাম জানতে পারলে আমাকে ভুল বুঝবেন। বিশ্বাস করুন আমি খুনের ব্যাপারের মধ্যে নেই।

—আমি যখন আছি তখন ম্যাডাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি নির্ভয়ে সমস্ত কিছু বলুন।

—ঘটনাটা আমার চোখের উপর ঘটল স্যার। অথচ লোকেশ ট্যাণ্ডনের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

—ওভাবে নয়, ঠিক যেভাবে যা যা ঘটেছিল সেইভাবে বলুন। ২১৬ নম্বর ঘরে টেলিফোন করার আগে থেকে আরম্ভ করুন। সঠিকভাবে ব্যাপারটা বুঝতে আমার সুবিধা হবে।

এরপর ব্রজবাবু যা বললেন তার প্রকৃত চিত্র নিম্নরূপ।

খাওয়াদাওয়া সেরে ব্রজবাবু রাত নটার মুখে নিজের ঘরে চলে এলেন। উনি শীতকাতুরে লোক। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেশ অস্বস্তিবোধ করছেন। জোড়া কম্বলের তলায় ঢুকে যে ঘুমের রাজ্যে চলে যাবেন তার উপায় নেই। ম্যাডাম দশটার সময় দেখা করতে বলেছেন। আগামীকাল কি সমস্ত করণীয় আছে তাই বলবেন।

ব্রজবাবু শুনেছিলেন, অ্যালকহল পেটে গেলে ঠাণ্ডার অনুভব কমে যায়। হুইস্কি খাবার সাহস হল না। অনভ্যাসের ফোঁটায় মাতাল হয়ে পড়তে পারেন। স্থির করলেন, বিয়ার খেতে খেতেই ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেবেন। তারপর দেখা করবেন ম্যাডামের সঙ্গে গিয়ে।

নীচে নেমে গিয়ে ব্রজবাবু এক বোতল নর্থপোল সংগ্রহ করে ঘরে ফিরে এলেন।

হ্ন গেলাসের সামান্য কিছু বেশী পানীয় থাকে বোতলে। অভ্যাস না থাকার দরুন যা হয়, চুমুকের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে রাখতে আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়লেন। যখন আচ্ছন্নের ভাব ভাঙল তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভারী নার্ভাস হয়ে পড়লেন ব্রজবাবু।

ম্যাডাম অনুশাসনহীনতা একেবারে পছন্দ করেন না। কি করা যায়। উনি কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন! ভেবেচিন্তে কোন কিছু করারই মনস্থ করলেন। জেগে থাকলে ক্ষমাটমা চেয়ে নেবেন। তারপর যাবেন দেখা করতে। রিসিভার তুলে নিয়ে ২১৬ নম্বর ঘর চাইলেন। যোগাযোগ হল সঙ্গে সঙ্গে। একবার রিং হবার পরই ওধার থেকে গলা পাওয়া গেল।

—হ্যালো—কে কথা বলছেন?

অবাক হয়ে গেলেন ব্রজবাবু। ওধার থেকে ম্যাডামের গলা পাওয়া যায়নি। সাড়া দিয়েছেন একজন পুরুষ। এরকম তো হবার কথা নয়। তবে কি ম্যাডামের পুরনো বন্ধু কুশল ব্যানার্জী ওখানে রয়েছেন? উনি সময় নষ্ট না করে উত্তর দিলেন।

—আমি ব্রজ বর্মন কথা বলছি। দয়া করে ম্যাডামকে লাইনটা দিন—

—আপনার ম্যাডাম ঘরে নেই।

—কোথায় গেছেন বলুন তো?

—আমি তো বলতে পারবো না—আপনি কে কথা বলছেন স্যার—

—লোকেশ—ব্রজবাবু আপনি এখানে আসুন একবার—

—আজ্ঞে আসছি--

ব্রজবাবু হন্তদন্ত হয়ে ২১৬ নম্বর ঘরে এলেন। উনিও চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এত রাত্রে ম্যাডাম গেলেন কোথায়? ভ্রূ কুঁচকে লোকেশ সোফায় বসেছিল। আঙুলের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট।

—স্যার, আপনি এখানে রয়েছেন?

লোকেশ বলল, ঋতু ভাবীর সঙ্গে আমার জরুরী কথা ছিল। এসে দেখি ঘরে নেই। কোথায় যেতে পারেন উনি?

—বলতে পারবো না স্যার। উনি আমাকে দশটার সময় ডেকেছিলেন। আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই ফোন করেছিলাম।

—একটা সন্দেহ আমার হচ্ছে ব্রজবাবু। আপনার ম্যাডাম তাঁর এলাহাবাদের বন্ধুর কাছে যাননি তো?

ব্রজবাবু বললেন, কি করে বলবো স্যার। আমি তো আদার ব্যাপারী—

—ভারী অন্যায়। একজন উটকো লোকের সঙ্গে তাঁর মত সম্ভ্রান্ত মহিলার এইভাবে মেলামেলশা করা কি ঠিক হচ্ছে?

ব্রজবাবু কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

লোকেশ আবার বলল, আপনি খোঁজখবর নিয়ে দেখুন কোথায় উনি গেছেন জানা দরকার।

ব্রজবাবুর লোকেশের সর্দারী ভাল লাগছিল না। উনি বিনোদবাবুর আত্মীয় হতে পারেন, তাতে হয়েছেটা কি? উনি মাথুর পরিবারের যৌথ কর্মচারী নন। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকেশ সোফা থেকে উঠে গিয়ে টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জগ থেকে জল ঢেলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে গেলাস শেষ করল। আবার ফিরে এল সোফার কাছে।

—আপনাকে কি বললাম, শুনেছেন?

ব্রজবাবু বললেন, আমি কোথায় খুঁজবো ওঁকে?

—এলাহাবাদের লোকটা কোন্ ঘরে আছে খোঁজ নিন। আপনার ম্যাডাম নিশ্চয় ওখানে আছেন।

—থাকতে পারেন। আমি ওখানে যেতে পারবো না। উপরপাড়া হয়ে কোন কাজ করা ম্যাডাম পছন্দ করেন না।

উত্তেজিতভাবে লোকেশ কিছু বলতে যাচ্ছিল—বলা হল না। দু হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরল। শরীরের টাল সামলানো সম্ভব হল না। হুড়মুড়িয়ে পড়ল মাটিতে। গলা চিরে চাপা একটা কাতরানি বেরিয়ে আসছে। শরীর মোচড় খেতে লাগল। তারপর স্থির হয়ে গেল এক সময়।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট দুয়েক সময় লেগেছে কিনা সন্দেহ। বিস্ফারিত চোখে ব্রজবাবু সমস্ত কিছু দেখলেন। একটা সন্দেহ মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠল। উনি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে লোকেশের দেহ পরীক্ষা করলেন। সন্দেহ মিথ্যা নয়। মারা গেছে লোকেশ ট্যাণ্ডন।

ব্রজবাবুর তখন দিশেহারা অবস্থা। ওঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এটা খুনের ব্যাপার। জগের জলে বিষ মেশানো ছিল। দুনিয়া দেখা মানুষ উনি। এও বুঝলেন, ম্যাডামকে খুন করার জন্য কেউ এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। দৈবাৎ লোকেশ মারা গেছে।

ভয় আর চিন্তা ব্রজবাবুকে ঘিরে ধরেছে। জগের জলে বিষ দেওয়া আছে কেউ জানে না। ম্যাডাম পরে ঐ জল খেতে পারেন। উনি দ্রুত জগটা তুলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলেন। বেসিনে সমস্ত জল ফেলে দিয়ে ফিরে এলেন আবার।

ঐ জল আর ম্যাডামের পক্ষে পরে খাওয়া সম্ভব হবে না। একটা বিপদ রয়েছে। মৃতদেহ এই ঘরে থাকলে পুলিস ওঁকেই সন্দেহ করবে। ব্রজবাবু চিন্তা করে দেখলেন,

মৃতদেহ যদি ঘরের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে ভয়ের কিছু থাকে না। অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান একটা দেহ তাঁর মত বয়স্ক ফিনফিনে লোকের পক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না।

উনি ভারী ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি এ ঘর থেকে চলে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল। ম্যাডাম হয়তো রাত্রে আর এ ঘরে আসবে না। কাজেই বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম। তবে জগ আর গেলাস সরিয়ে দিতে হবে। পুলিস যদি এ দুই পাত্রে বিষের সন্ধান পায় তাহলেই ঝামেলা।

ব্রজবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না। জগ আর গেলাস শালের তলায় ঢেকে বেরিয়ে পড়লেন। নিজের ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পরও অস্বস্তি ও আশঙ্কা তাঁকে ঘিরে রইল। অবশ্য করণীয় কাজটা সেরে ফেলতে উনি বিলম্ব করলেন না। জগ আর গেলাস চালান করে দিলেন স্যুটকেসের মধ্যে।

ব্রজবাবুর বলা শেষ হলে বাসব বলল, আপনি যা কিছু বললেন আশা করি তার মধ্যে ছিটেফোঁটাও বানানো নয়?

—না স্যার। যা ঘটেছিল তাই বলেছি।

—পরে আপনার ম্যাডামকে ব্যাপারটা কি বলা উচিত হয়নি? কেন বলেননি বলুন তো?

—সাহস হয়নি।

—এত বড় ব্যাপার! তবু সাহস সংগ্রহ করতে পারলেন না?

—আমার ধারণা হয়েছিল, ম্যাডাম এর অন্য মানে করে বসবেন। আমি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো না। বিশ্বাস করুন স্যার ঘটনাটা লুকিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি আর কোন অপরাধ করিনি।

—ঠিক আছে। আপনি এখন যেতে পারেন।

—এই কথাগুলো পুলিসের কানে গেলে কিন্তু—

—আমি অনুসন্ধান করে নিশ্চিত হয়ে গেলে পুলিস কিছুই জানতে পারবে না। তবে উল্টো দিকে যদি সামনে এসে পড়ে আমি তাহলে নিরুপায়। আচ্ছা, আসুন তাহলে।

ব্রজবাবু বিদায় নিলেন।

বাসব শৈবালের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার হল।

বাসব পাইপে মিক্সচার ঠাসতে ঠাসতে বলল, আমার প্রশ্নের উত্তরে সেদিন মিসেস ব্যানার্জী যেই বললেন, তিনি হলে জগ আর গেলাস শাড়ির আড়ালে নিয়ে

পরে পড়তেন, সেই মুহূর্তে ব্রজবাবু আমার চোখের উপর ভেসে উঠলেন। কারণ একমাত্র তিনিই এঁদের মধ্যে ধুতিওয়ালা লোক। ঠাণ্ডা থাকার দরুন গায়ে চাদর থাকাই স্বাভাবিক।

—এতে কিন্তু মূল ব্যাপারের সুরাহা হল না। আসল ব্যক্তি এখনও অন্ধকারে।

—আবার আলোর দিকে এগিয়ে আসছে তাও বলা যায়। আমি তাকে প্রায় চিনে ফেলেছি তবে পরিতাপের কথা কি জানো ডাক্তার লোকটাকে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে না।

—কেন ?

—প্রমাণ কই ? একজনকে অভিযুক্ত করতে গেলে স্থূল প্রমাণের দরকার হয়। টার্গেট মিস করলেও লোকটা আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছিল। আমি তাকে অন্য প্যাঁচে ফেলবো স্থির করেছি।

শৈবাল বলল, ক্রমেই বেশ প্যাঁচালো হয়ে উঠছো। তা সেই প্যাঁচটা কি ?

—নতুন কিছু নয়। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাপার। এসব হত্যাকারীরা পেশাদার হয় না। স্বার্থের খাতিরে অপরাধ করার আগে হাজার সতর্কতা অবলম্বন করলেও পেশাদারদের মত নার্ভ এদের হয় না। মনের মধ্যে অপরাধী বোধ, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় সব সময় ওঠানামা করতে থাকে। এর সুযোগ আগেও আমি অনেক তদন্তে নিয়েছি ডাক্তার। এবারও চেষ্টা করে দেখবো।

—সুযোগটা কি ?

—টোপ। আজ সন্ধ্যায় টোপ ফেলার ব্যবস্থা করছি। উইলটা এখন পড়া দরকার। তোমাকে সব বলছি। তুমি বরং কফির ব্যবস্থা দেখো।

বাসব সেণ্টার্‌পিস থেকে উইলের খামটা তুলে নিল।

বিকেল পাঁচটার পরে কুশাল এল ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসব অলস ভঙ্গীতে শৈবালকে কিছু বলছিল। ওদের দেখে মৃদু হাসল।

বসতে ইঙ্গিত করল। বসার পর ঋতু ট্রেনের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে বলে গেল।

বাসব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় বিনোদ ও প্রমোদ ঘরে এল। ওদের পিছু পিছু রাকেশ। তিনজনের মধ্যে কারুর মুখের অবস্থা ভাল নয়। আজ দুপুরে ফোন করে এই সময় এখানে উপস্থিত হতে বলা হয়েছিল।

বিনোদ বললেন, এ কি ধরনের জুলুম। আমাদের আটকে রেখেছেন ? যখন-তখন বিরক্ত করছেন ?

বাসব বলল, উপায়হীন অবস্থায় আপনাদের আটকাতে হয়েছে।

—আমাদের কাজকর্মের কত ক্ষতি হচ্ছে বোঝেন ?

—অবশ্যই বুঝি। কিন্তু উপায় কি বলুন না ?

—ছেলেখেলা পেয়েছেন ? এই কেসের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক কি ? আমি আজই রাত্রের ট্রেনে কলকাতা রওয়ানা হবো জানিয়ে রাখলাম। আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

বাসব ভারী গলায় বলল, ধৈর্যের একটা সীমা সত্যি থাকা উচিত। আপনি আজ রাত্রে পাটনা ছাড়তে পারেন। তবে যাবার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতে হবে।

—কোন্ প্রশ্নের উত্তর ?

—উত্তর সঠিক হওয়া চাই।

—বলুন ?

ব্রজবাবু ঘরে ঢুকলেন।

ঋতু ও কুশল যে সোফায় বসেছিল, উনি তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাসব প্রশ্নের জের না টেনে পাইপ ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবে এক টান দিয়েছে, সহাস্যে ঘরে ঢুকলেন কুলদীপ মেহরা। বাসব বসতে অনুরোধ জানিয়ে ওঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিল।

মেহরা বললেন, এই অঞ্চলে এসেছিলাম। ভাবলাম, একবার হোটেলে ঘুরে যাই। আপনি বোধহয় এঁদের নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমি বরং—

—আপনি এসে পড়ায় ভালই হয়েছে—বাসব বলল, বসুন। লোকেশ মার্ডার-কেস সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। আপনি শুনুন। তবে তার আগে প্রশ্ন-উত্তরের একটা ঝামেলা রয়েছে বিনোদবাবু—

—বলুন ?

—আপনি তো লুঙ্গি পছন্দ করেন না। তবে কেন ১১ই জানুয়ারী রাতে আপনি শোবার সময় লুঙ্গি ব্যবহার করেছিলেন ?

—লুঙ্গি—মানে—

—কথাটা আপনার কাছ থেকেই শোনা। প্রমোদবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাও আপনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, লুঙ্গি পরেই শুয়েছিলেন।

—বলেছিলাম। তাতে কি হয়েছে ?

বাসব হালকা গলায় বলল, আপনার পক্ষে একটু অস্বস্তিরই কারণ হয়েছে। আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন। লুঙ্গি নয়, সেদিনও আপনি নিজের অভ্যাস মত স্লিপিং স্যুট ব্যবহার করেছিলেন।

কাঁপা গলায় বিনোদ বললেন, না। আপনি বললেই মেনে নেবো? সেদিন আমি লুঙ্গি পরেছিলাম।

—বেশী স্মার্ট হবার চেষ্টা করবেন না। সেদিন ২০০ নম্বর ঘরে আদিত্য সোম নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি দেখেছেন, রাত সাড়ে এগারটার কাছাকাছি আপনি স্লিপিং স্যুট পরা অবস্থায় নিজের ঘরে ঢুকছেন।

—আমি আদিত্য সোমকে চিনি না।

—তিনিও আপনাকে চেনেন না। ঘরের নম্বরই আপনাকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। বলুন, কেন মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

—আমি বলছি—আমি তো—

—আপনি নিজের বিপদ বুঝতে পারছেন না। যা হোক—মিঃ মেহরা—

—বলুন মিঃ ব্যানার্জী—

—আপনি কি একাই এসেছেন?

—গাড়িতে দুজন লোক রয়েছে।

—আমি এই ভদ্রলোকের ঠিকানা দিচ্ছি। আপনার লোকেরা ওখানে গিয়ে তল্লাস করে দেখুক, এঁর কাপড়চোপড়ের মধ্যে লুঙ্গি আছে কিনা।

—বেশ তো। আমি ব্যবস্থা করছি। ভাল কথা, লুঙ্গি না পাওয়া গেলে এঁকে অ্যারেস্ট করতে হবে বোধহয়?

বিনোদ আর স্থির থাকতে পারলেন না।

বিচলিত ভঙ্গীতে বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, স্লিপিং স্যুট পরায় আমি এমন কি অন্যায় করেছি? সেদিন নার্ভাস হয়ে পড়ায় লুঙ্গির কথা বলেছিলাম।

বাসব বলল, আজ? আজও বলেছেন। এখন সঠিকভাবে বলুন, সেদিন রাত এগারটার পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমি—ঠিক মনে—

—মনে পড়ছে না? নাটক করবার চেষ্টা করবেন না। আসল কথাটা কি না বললে আমি আপনাকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হব।

বিনোদ এবার ভেঙে পড়ার মুখে।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি একান্তে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—বেশ তো, আসুন।

বাসব বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উপস্থিত বাকী সকলে অবাক নিশ্চয় হলেন, তবে মুখে কিছু বললেন না।

মিনিট সাতেক পরে ফিরে এল দুজনে। বিনোদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠেছে। বাসব নির্লিপ্ত মুখে বসলো নিজের আসনে।

সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, আপনারা অনেকেই মনে মনে আমার উপর বিরক্ত হচ্ছেন। খুবই স্বাভাবিক। তবে কোন তদন্ত হাতে নেওয়ার পরই হেলায় সম্পন্ন হয়ে যাবে তার কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যা হোক, এবার আমি কাজের কথায় আসি। লোকেশ ট্যাণ্ডন ঐ অসময়, পরের ঘরে গিয়ে কেন খুন হলেন সে রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা পুলিস বা আদালত কোন পক্ষই করেননি। এই দুই পক্ষই স্থূল সন্দেহের আধারে একজনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করেছেন। অথচ বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে লোকেশ ট্যাণ্ডন। হত্যাকারী তাঁকে মারতে চায়নি।

কুলদীপ মেহরা প্রশ্ন করলেন, হত্যাকারীর টার্গেট কে ছিল ?

—আমার মক্কেল ঋতু ব্যানার্জী বা তৎকালীন মিসেস মাথুর।

ঋতু চমকে উঠল।

আর সকলেও কম অবাক হল না।

বাসব আবার বলল, মিঃ মেহরা, এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এই চক্রান্তের মূলে আছে বিপুল অর্থসম্পত্তি গ্রাস করার ব্যগ্রতা। জগের জলে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল মারকিউরিক ক্লোরাইড। অর্থাৎ কোন একসময় আমার মক্কেল জল খেয়ে মারা পড়বেন। বিধির বিড়ম্বনা বলুন বা হত্যাকারীর দুর্ভাগ্য—ঐ জগ থেকে জল খেলেন লোকেশ। উনি সেদিন বেশী মাত্রায় ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলেন। কেউ কেউ ড্রিঙ্কের কিছু পর থেকে তেষ্টা অনুভব করেন। ঐ তেষ্টাই লোকেশকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এখন দেখতে হবে এই নির্মম কাজ করেছে কে ?

মেহরা বললেন, আমার মনে হয় হত্যাকারীর স্বরূপ প্রকাশ করার একটা সূত্রই রয়েছে—মারকিউরিক ক্লোরাইড।

—আপনি ঠিকই বলছেন। আশার কথা কাল সকালেই মারকিউরিক ক্লোরাইড কে সংগ্রহ করেছিল তার সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। ইনফরমার আমাকে সংবাদ দিয়েছে, একজন স্থানীয় ব্যবসাদার কিছু ফেবারের পরিবর্তে আমাকে অনেক গুপ্ত কথা জানাবে। কাজেই কালই আমি হত্যাকারীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করে দেব। আপনাদের আর ধৈর্যের পরীক্ষা নেব না। আজ এই পর্যন্ত। কুশলবাবু—

—বলুন ?

—কাল সন্ধ্যার ফ্লাইটে ফিরতে চাই। দুটো টিকিটের ব্যবস্থা দেখবেন।

কুশল বলল, ব্যবস্থা করে রাখবো। কিন্তু কালই চলে যাবেন—

—হত্যাকারী অ্যারেস্ট হয়ে যাবার পর আমার এখানে আর কি কাজ থাকতে পারে? ঐ কথাই রইল তাহলে।

সকলে উঠে পড়েছিলেন।

কুলদীপ মেহরা ছাড়া আর সকলে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে।

রাত তখন সাড়ে নটা। ফ্রেজার রোডের একটা ড্রাগ-হাউসে ষণ্ডামত একজন ঢুকলো। সে এধার ওধার একবার তাকিয়ে নিল। দোকানে তখন ক্রেতার তেমন ভীড় ছিল না। কাউণ্টারে বসা একজনের দিকে এগিয়ে গেল লোকটা।

—আমি ফোন করতে চাই।

—এক টাকা লাগবে।

ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কাউণ্টারে রাখল, তারপর ষণ্ডা লোকটা টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে গিয়ে পৌছল। রিসিভার তুলে নিয়ে আরম্ভ করল ডায়েল করতে। কয়েকবার রিং হবার পরে ওধারে কেউ রিসিভার তুলে নিল।

—রণধীর কথা বলছি—

—শেঠজীর নির্দেশে ফোন করছি—দু লাখ টাকা দিয়ে ব্যাপারটায় রফায় আসুন—নইলে—

—আমি কি করবো বলুন—শেঠজী যা বলেছেন আপনাকে জানালাম—ইচ্ছে করলে কথা বলে দেখতে পারেন। বাড়িতেই আছেন উনি—ছাড়ছি এখন—

রণধীর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে কয়েক মিনিট আগে।

নির্জন বেলি রোড শূন্যতার কোলে ঢলে রয়েছে। মাঝে-মধ্যে দু-একটা গাড়ি দ্রুতবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুধারের গাছের ফাঁক দিয়ে এখানে-ওখানে চাঁদের টুকরো আলো এসে পড়েছে।

একটা রিকশা মন্থর চালে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সময়ের হিসাবে এই ত্রিচক্র যান ভারী বেমানান এখানে। যাত্রী একজনই। আলোর তেজ না থাকায় যাত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাইকোর্টকে বেশ কিছুটা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবার পর যাত্রী রিকশা থেকে নামল। ভাড়া মিটিয়ে দেবার পর সে একটা সরু রাস্তার মধ্যে ঢুকলো।

এই সময় লোডসেডিং আরম্ভ হল।

অন্ধকার আরো যেন চাপ বেঁধে এল। যখন-তখন পাওয়ার চলে যাওয়া পাটনার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীর কিন্তু কোন অসুবিধা হল না। স্বচ্ছন্দ গতিতেই এগিয়ে চলেছে। মনে হয় এই পথে সে বহুবার যাতায়াত করেছে।

আরো শখানেক গজ এগুবার পর যাত্রী থামল। সামনেই একতলা একটা বাড়ি। মরা চাঁদের আলোয় আবছা দেখাচ্ছে। যাত্রী স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে গেল। দরজার পাশে পুসার। ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে পুসারে চাপ দিল।

একবার—দুবার—

ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, কে—

—খোল। আমি—

দরজা খুলে গেল।

গৃহকর্তা মাঝারি সাইজের মোটাসোটা লোক। টেবিলের উপর কেরোসিন তেলের ল্যাম্প জ্বলছিল। ম্লান আলোর দরুন, ঘরের চারধারে কেমন চাপা চাপা ভাব। যাত্রী গৃহকর্তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে এল।

বিস্ময়ের সুরে গৃহকর্তা বললেন, এতরাত্রে এলে, কি ব্যাপার?

—অজ্ঞতার ভান করো না। তুমি ভালই জানতে আমি আসবো।

—কি ভাবে জানবো? কোন সূচনা পাঠিয়েছিলে কি?

তীক্ষ্ণ গলায় যাত্রী বলল, সূচনা তুমিই পাঠিয়েছিলে। আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও—দু লাখ টাকা চাই তোমার? আবার পুলিস ইনফরমারকে ভেতরের কথা জানাবে বলে আশ্বস্ত করেছো। ইউ স্কাউণ্ড্রেল—

—গালাগাল দেবেন না।

—নিশ্চয় দেবো। মনে করেছো আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে তুমি দূরে বসে মজা দেখবে? সে সুযোগ তোমায় দেব না। আমি এখনই হিসাব চুকিয়ে ফেলতে চাই।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আজেবাজে বকে চলেছো। ভুলে যেও না আমার সহ্যের একটা সীমা আছে।

কথা শেষ করেই গৃহকর্তা চমকে উঠলেন।

আগন্তুকের হাতে বেঢপ একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে।

—তুমি আমাকে গুলি করবে?

—তোমার মত বিরক্তিকর সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। সাইলেন্সার লাগানো আছে। শব্দ কারুর কানে যাবে না।

এরপরই চাপা একটা শব্দ।

গৃহকর্তা ঝটিতি একপাশে সরে গিয়েও নিজেকে পুরোপুরি ভাবে রক্ষা করতে পারলেন না—পাকসাট খেয়ে পড়লেন একধারে। কাতরোক্তির রেশ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের চারধারে। তার পরই ঘটল অভাবনীয় ঘটনা।

ঘরের ওধারের দরজার কাছ থেকে খানকয়েক টর্চ ঝলসে উঠল। দ্বিতীয়বার গুলি চালাবার মুহূর্তেই আগন্তুক থমকে গেল। বিপদ ঘিরে আসছে বুঝতে পেরেই সে ঘুরে দাঁড়াল। বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ওর উদ্দেশ্য। কিন্তু ততক্ষণে ওধার থেকেও টর্চের আলো এসে পড়েছে ওর উপর।

কে একজন বলে উঠল, রাকেশবাবু, আপনাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে দিন।

রাকেশ দিক্ষিত ঘামতে লাগলেন।

বাসব কয়েক পা এগিয়ে এল।

—কয়েকটা রাইফেল আপনাকে তাক করে রয়েছে। কথা না শুনলে ঝাঁজরা হয়ে যাবেন। পিস্তলটা ফেলে দিন।

ধাতব শব্দ তুলে অস্ত্রটা মাটিতে পড়ল। একজন দ্রুত এগিয়ে এসে তুলে নিল ওটা। দুজন চেপে ধরল রাকেশকে। কুলদীপ মেহরা ও বাসব গৃহকর্তার কাছে গিয়ে পৌছল। উনি কাতরাচ্ছেন, ভাগ্য ভাল জ্ঞান আছে। গুলি বাঁ হাতের মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। দ্রুত ওঁকে পুলিস জীপের সাহায্যে হাসপাতালে পাঠানো হল।

বাসব রাকেশের সামনে এসে দাঁড়াল।

বলল মৃদু গলায়, আটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনা করেছিলেন। পুলিস বা আইন আপনাকে চিহ্নিত করতে পারেনি। আপনি অন্ধকারে রয়ে গিয়েছিলেন। অগত্যা আমাকে এই চালটা দিতে হল। আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই যে এই ভাবে টোপ গিলবেন ভাবতে পারিনি।

বাসব ঘুরে দাঁড়াল।

—মিঃ মেহরা, আসামী হাজির। রাত জাগা স্বার্থক হয়েছে। এর পরের কাজ অবশ্য আপনাদের হাতে।

—ধন্যবাদ মিঃ ব্যানার্জী। মেহরা বললেন, এর পর যা কিছু করণীয় আমরা দেখছি। আপনি কি এখন—

—হোটেলে ফিরবো। কাল দেখা হচ্ছে। এস, ডাক্তার—

কলকাতাগামী ফ্লাইটে জায়গা পাওয়া গেল না।

গভীর রাজনৈতিক তৎপরতার দরুন ভারী চাপ চলেছে প্লেন সার্ভিসের উপর। অমৃতসর মেলের এসি বগিতে চারটে বার্থ পাওয়া গেছে। ঋতু এবং কুশলও চলেছে ওদের সঙ্গে কলকাতা।

দুর্নিবার লোভের বশবর্তী হয়ে রাকেশ যে পরিকল্পনা খাড়া করেছিল, তার পরিণামস্বরূপ সে এখন জেলের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ। সে যে মূল কাণ্ডের হোতা, কেউ তা কল্পনাই করতে পারেনি। কুলদীপ মেহরা সহর্ষে বাসবের বাহাদুরী স্বীকার করে নিয়েছেন। পাঞ্জাবী কায়দায় ডিনার সেরেই ওরা মেহরা সাহাবের বাংলো থেকে স্টেশনে এসেছে।

মেল ছেড়ে গেল।

ঋতু ম্রিয়মান ভঙ্গীতে বসে আছে। বাকী তিনজন নিজেদের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলেও বাসব মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল ওর দিকে। এবার উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগুলো। মেল দুরন্ত গতিতে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাসবের উদ্দেশ্য অবশ্য করিডরে দাঁড়িয়ে পাইপের সদ্‌ব্যবহার করা।

—মিঃ ব্যানার্জী—

ঋতুর ডাকে বাসব থামল।

—বলুন ?

—ভারী খারাপ লাগছে। দাদা কাণ্ডটা বাধিয়েছে আঁচ করতে পারলে আমি আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করতাম না। কেন যে এমন হয়—

বাসব ওর পাশে বসে পড়ে বলল, এই রকম হয়। অর্থ সর্বকালের অনর্থের মূল। আপনি অনর্থক মন খারাপ করে বসে আছেন। মনে রাখবার চেষ্টা করুন আপনার দাদা আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ তো ভাগ্যের খেলা আপনার পরিবর্তে লোকেশ ট্যাণ্ডন মারা গেল।

—দাদা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল একথা ভেবেই খারাপ লাগছে। তবু আমি চাই না ওর শাস্তি হোক।

—আপনার মহানুভবতা। আমাদের চাওয়া না চাওয়াতে কিছু আসবে যাবে না। রাকেশ দিক্ষিতের শাস্তি হবেই।

কুশল বলল, আপনি কি প্রথমেই ওঁকে লোকেট করতে পেরেছিলেন ? কিভাবে ব্যাপারটা ঘটেছিল বলেন যদি—

—প্রথমে আমি রাকেশকে সন্দেহ করিনি। আমার প্রথম চিন্তা ছিল খুন কে করেছে তা নয়—খুন কিভাবে হয়েছে। জগ আর গেলাস ২১৬ নম্বর ঘর থেকে লোপাট হয়ে যাওয়া চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। পুলিস ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আমি গুরুত্ব না দিয়ে পারলাম না। নিরীহ বস্তু দুটোর অনুপস্থিতি কিসের ইঙ্গিত? ভাবতে ভাবতে একটা পয়েন্টে আমি নিশ্চিত হলাম। জগের জলে মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশানো ছিল। সুতরাং হত্যাকারী তাকেই মারতে চেয়েছিল যে ২১৬ নম্বর ঘরের বোর্ডার ছিল। অর্থাৎ টার্গেট ছিলেন শ্রীমতী ঋতু। একটা বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল হতভাগ্য লোকেশ ঐ জগ থেকে জল খেয়ে মারা গেছে। প্রশ্ন উঠবে, গভীর রাত্রে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লোকেশের তেষ্টা পাবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তারের কথায় পেলাম। অত্যধিক অ্যালকোহল পেটে গেলে কোন কোন লোকের ভীষণ তেষ্টা পায়। লোকেশ স্বভাবের দোষেই মারা পড়েছে।

বাসব থামল।

হালকা শব্দ তুলে মেল একটা স্টেশন অতিক্রম করে গেল। মোকামার আগে আর কোন স্টপেজ নেই। ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে তিনজনকে দিল ঋতু। নিজেও নিল। কয়েক চুমুকে কফি শেষ করে বলতে আরম্ভ করল।

—শ্রীমতীকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ওঁর বিপুল সম্পত্তি করায়ত্ত করার এ এক ব্যর্থ প্রয়াস। লিস্ট থেকে বিনোদ মাথুরকে বাদ দিতে হল। কারণ তাঁর পরিকল্পনা ছিল, বৌদিকে শালাজ বানিয়ে সমস্ত কিছুর উপর আধিপত্য করবেন। কিন্তু জগ আর গেলাস নিয়ে সরে পড়ল কে? লোকেশের মারা যাবার পর ও দুটো তো যথাস্থানেই থাকার কথা। এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়, আরো একজন ঐ ঘরে ঢুকেছিল। হোটেলের এক্সচেঞ্জ রেজিস্টার ঘাঁটতেই তার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি আপনাদের ব্রজবাবু।

বিস্ময়ের সুরে ঋতু বলল, ব্রজবাবু! তিনি অসময়ে আমার ঘরে কি করতে গিয়েছিলেন?

—আপনি ওঁকে দশটার সময় দেখা করতে বলেছিলেন।

—হ্যাঁ। একটা কাজ মনে পড়ে গিয়েছিল। ওঁকে বুঝিয়ে দিতাম কি করতে হবে। পাটনায় উনি থেকে যেতেন।

—ব্রজবাবুর চটকা ভাঙল সাড়ে দশটার পর। ভয়ে ভয়ে উনি ফোনে যোগাযোগ করলেন আপনাকে। রিসিভার তুলল লোকেশ। হতবাক ব্রজবাবু ছুটলেন ২১৬ নম্বর ঘরে। লোকেশ জানতে চাইল আপনি কোথায় আছেন—মিঃ ব্যানার্জীর ঘরে কিনা ইত্যাদি। এই সময় তার তেষ্টা চাগিয়ে উঠল। ব্রজবাবু জগ থেকে জল গড়িয়ে দিলেন। জল খাবার পরই লোকেশ মারা গেল। ব্রজবাবু ঘাবড়ে গেলেন। ওঁর চিন্তা হতে লাগল আপনাকে নিয়ে। ডেডবডি করিডরে এনে ফেলে রাখার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অগত্যা জগ আর গেলাস নিয়ে সরে পড়লেন।

এদিকে যত রাত বাড়তে লাগল বিনোদ মাথুর তত বেশী চিন্তিত হতে লাগলেন। লোকেশ এতক্ষণ কি করছে? শেষে থাকতে না পেরে উনিও পৌছলেন ২১৬ নম্বর ঘরে। লোকেশ মারা গেছে বুঝতে পেরেই তাঁর মাথায় এল নতুন প্ল্যান। বৌদি শালাজ হলেন না বটে, তাতে তাঁর দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলার জন্য বলশালী বিনোদ মৃতদেহ বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেললেন—ড্রেসিং টেবিলের উপর পার্স থেকে রুমাল বার করে লোকেশের হাতে গুঁজে দিলেন।

এর পর আমি মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলাম, নাটের গুরু সম্পর্কে প্রয়াত মাথুর সাহাবের উইল পড়ে দেখলাম উনি, নিজের অবর্তমানে স্ত্রীর দায়িত্ব নিজের সহোদরদের দিতে চাননি। তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তার মোটামুটি অর্থ হল তাঁর স্ত্রী চাইলে নিজের বড় ভাইয়ের সহযোগিতা নেবেন। এবং হঠাৎ যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে, তাঁর কন্যা ও সম্পত্তির সমস্ত দায়িত্ব নেবেন শ্যালক রাকেশ দিক্ষিত। এই উইলের বয়ানেই রাকেশকে লোভী করে তুলেছে। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আমাকে সঠিক পথ দেখালো। শ্রীমতী ঋতুর ঘরের জগের জলে মারকিউরিক ক্লোরাইড মেশাবার সুযোগ একমাত্র রাকেশেরই ছিল। বিনোদ বা প্রমোদ কড়া মেজাজের বৌদির ঘরে যাওয়ার যতটা অসুবিধা ছিল, তার চেয়ে সহস্রগুণ সুযোগ বড় ভাইয়ের থাকাই স্বাভাবিক। আমার ধারণায় দুই ভাইবোনের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল তখন শ্রীমতীর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে উনি জগের জলে অভীষ্ট বস্তুটি ফেলে দেন। মিসেস ব্যানার্জী, আপনি কি দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক-আধবার নিজের আসন ছেড়ে উঠে কোথাও গিয়েছিলেন?

ঋতু একটু ভেবে নিয়ে বলল, ভারী বিরক্ত লাগছিল। যতদূর মনে পড়ছে, আমি একবার জানলার কাছে গিয়েছিলাম।

—ঐ সময় সুযোগটা নিয়েছেন আপনার দাদা। যা হোক, রাকেশ দিক্ষিত সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আমি প্রথমে সংগ্রহের দৌড়ে লেগে পড়লাম। ব্রজবাবুর কাছ থেকে সহজেই জানা গেল রাকেশ দিক্ষিতের পাটনায় যে ব্যবসায়িক পার্টনার আছে তার নাম ঠিকানা। কারণ এটা সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল, সেক্ষেত্রে রাকেশ মোটেই জানতেন না, তাঁর সহোদরা এই সময় পাটনায় থাকবেন। সুতরাং এলাহাবাদ থেকে পরিকল্পনা হাতে নিয়ে এখানে আসেননি। এখানে এসে পার্টনারের মুখে শুনলেন ঋতু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেললেন, ফেলে রাখা কাজটা এখানেই এবার শেষ করে ফেলবেন। দ্রুত প্রস্তুতি নিতে হল। কাজেই পার্টনারের সহযোগিতা হয়ে উঠল অপরিহার্য। নইলে মারকিউরিক ক্লোরাইড সংগ্রহ হবে

কিভাবে।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে টোপ ফেলার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। বহুবার আমি এই পথ বেয়ে সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছেছি। রাকেশ দিক্ষিতকে ফোন করলাম। এমন ভাবে কথা বললাম, যাতে মনে হতে লাগল পার্টনার ব্ল্যাকমেল করার পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। রাকেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, পার্টনারকে শান্ত করতে না পারলে, সে পুলিসের কাছে মুখ খুলতে পারে। টাকা দিয়ে শান্ত করা যাবে না—কারণ তার দাবী বিরামহীন ভাবে চলতে থাকবে। কাজেই এত বড সাক্ষীকে ঘাডে চাপিয়ে রাখা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। কাজেই চিরদিনের মত শান্ত করে দেওয়াই হল একমাত্র পথ। এধারে রাকেশকে ফোন করে দেওয়ার পর পুলিসের সহযোগিতায় পার্টনারকে চেপে ধরলাম। তাকে বুঝিয়ে বললাম এবার কি ঘটতে পারে এবং তাকে কি করতে হবে। অসম্ভব নার্ভাস হয়ে যাওয়া সেই লোকটার আমার কথায় রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। এরপর যা কিছু ঘটেছে আপনারা তা আগেই জেনে গেছেন।

এতক্ষণ পরে বাসব পাইপ ধরাবার জন্য ব্যস্ত হল।

ঋতু বলল, এত সব না করে দাদাকে তো আগেই ধরা যেত?

—তুমি ভেবেচিন্তে কিছু বলছো না—কুশল বলল, অকারণে কাউকে ধরা যায়? প্রমাণ হাতে থাকা চাই তো?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাসব বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এত কাণ্ড করার পরও এক্ষেত্রে আমরা একটু বেকায়দায় আছি। রাকেশবাবু পুলিসের চাপে পডে সব যদি স্বীকার করে নেন ভাল কথা, নইলে আদালতে প্রমাণ করা যাবে না, উনি লোকেশ ট্যাণ্ডনকে খুন করেছেন বা নিজের সহোদরাকে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাবেন তাও নয়। পার্টনারকে গুলি মারা এবং লাইসেন্সহীন অস্ত্র ব্যবহার করা দুটোই তার বিরুদ্ধে যাবে। পাঁচ-সাত বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে জানবেন।

মেলের গতি মন্থর হয়ে আসছে।

মোকামা বোধহয় এসে গেল।

—